মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৭ম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

অক্টোবর-২০২৪ ঈসায়ী

রবিঃ অউঃ-রবিঃ সানি-১৪৪৬ হিজরী

আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১

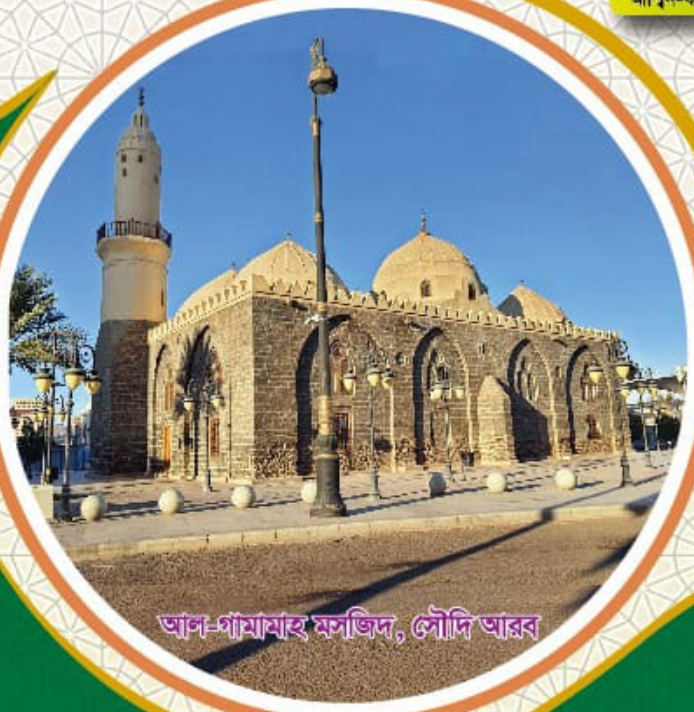

আল-গামামাহ মসজিদ, সৌদি আরব

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৩য় পর্ব

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২৪ ঈসায়ী

রবিঃ আউঃ-রবিঃ সানিঃ ১৪৪৬ হিজরী

আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
❖ দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষের পরীক্ষা হবে।........................ ৩
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
দারসুল হাদীস
❖ সকল প্রকার হক যথাযথ আদায় করা।...........................৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
সম্পাদকীয়
❖ দেশ পুনর্গঠন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার আহ্বান.. ৯
প্রবন্ধ :
❖ আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : সংকট ও নিরসন ভাবনা।..১০
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
❖ বছরের বিভিন্ন সময়ে সিয়াম পালন : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায়।......................................১৩
প্রফেসর ড. মো: ওসমান গনী
❖ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর হুকুম।...............................১৬
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
❖ আল-কুরআনে মানুষ : মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ।..........১৮
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান।.......................২২
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ সৎ কাজে দ্রুত ধাবিত হওয়ার গুরুত্ব।.......................২৬
শেখ ইয়াছিন বিন আরশাদ
❖ বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য মক্কার পার্লামেন্টে যে লোমহর্ষক সিদ্ধান্ত পাস হয়েছিল..........................২৮
অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের
❖ সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান : গুরুত্ব ও তাৎপর্য।...............৩১
মোহাম্মাদ মিযানুর রহমান
শুব্বান পাতা
❖ সালাফী মানহাজ অনুসরণের আবশ্যকতা ও বিদ'আতীদের প্রতি শিথিলতা এবং কঠোরতা অবলম্বনের মূলনীতি?...............৩৫
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম
❖ হারামের রহস্য কী?।...৪১
শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।..৪৪

দারসুল কুরআন/مدروس القرآن

দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষের পরীক্ষা হবে

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী❖

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

অনুবাদ : প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর মন্দ ও ভালো দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার নিকট তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : আল্লাহর তা'আলার বাণী : ذَائِقَةُ الْمَوْتِ-শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্বাদন করার পদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপেক্ষিতে দেহ হতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

রাসূল ﷺ বলেছেন : إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ -মৃত্যুযন্ত্রণা অত্যন্ত কঠিন।[২]

তাফসীরবিদদের মতে, দেহপিঞ্জর হতে আত্মা বেরিয়ে যাওয়াই হলো মৃত্যু। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্রহ দেহে সঞ্চারিত থাকে। যেমন গোলাপের পানি গোলাপ ফুলের সর্বত্র লেগে থাকে।

মৃত্যুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।[৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন :

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾

বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছো তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৪]

রাসূল ﷺ বলেছেন :

أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت তোমরা ভোগ-বিলাস বিনষ্টকারী বস্তুকে অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ কর।[৫]

অনুরূপ ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

أنه قال كنت مع رسول الله ﷺ فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي ﷺ ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس .

তিনি বলেছেন, আমি কোনো একসময় রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন আনসারী ব্যক্তি এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ মুমিন ব্যক্তি বেশি উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন : যার চরিত্র বেশি ভালো। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো যে, কোন্ মুমিন ব্যক্তি বেশি বিচক্ষণ? রাসূল ﷺ বললেন : যে মুমিন ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই বেশি বিচক্ষণ।[৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল এবং মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী সময়ের ব্যাপারে বিশ্বাসী হবে, তার উচিৎ হবে দুনিয়ামগ্ন না হয়ে বেশি করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলাও সর্তক করে দিয়ে বলেছেন :

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾

❖ ***সহ-সভাপতি,*** *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও* ***ভাইস প্রিন্সিপাল,*** *মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।*

[১] *সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫।*

[২] *সহীহ বুখারী, হা : ৪৪৪৯*

[৩] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭৮।*

[৪] *সূরা আল-জুমু'আহ, আয়াত : ৮।*

[৫] *তিরমিযী, হা : ২৩০৭।*

[৬] *ইবনু মাজাহ, হা : ৪২৫৯।*

হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ও'য়াদা সত্য; অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারণা না করে।[৭]

আল্লাহর বাণী : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। প্রত্যেক স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয় যেমন- অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে মন্দ বলে, অপরদিকে ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় বিষয় যেমন- সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র্য-ধনাঢ্য, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে হালাল, হারাম, আনুগত্য, অবাধ্যতা, হেদায়াত ও পথভ্রষ্টাতা এসবই পরীক্ষার সামগ্রী।[৮]

আল্লাহর বাণী : وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ অর্থাৎ, আমার নিকটে প্রত্যাবর্তনের পর ওপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান অনুযায়ী আমি প্রতিদান প্রদান করব। সার্বিক ব্যাপারে ও অবস্থায় যে আল্লাহকে ভয় করে মুমিনের অবস্থানে থাকবে সে সওয়াব লাভ করবে, আর যে খারাপ করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

মানুষকে পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেছেন :

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[৯] আল্লাহ আরো বলেছেন :

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে কষ্ট ও দুর্দশা স্পর্শ করেছিল এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সঙ্গী মুমিনরা বলেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন (আসবে)? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।[১০]

মুমিনদেরকে বিশেষভাবে যে পরীক্ষা করা হবে, সে মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে আর অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।[১১]

মানুষদের যে পরীক্ষা করা হবে এবং ইতঃপূর্বে করা হয়েছে, বিশেষ করে মুমিনদেরকে এবং যারা তুলনামূলক যত বেশি সৎকর্মপরায়ণ তাদের সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়েছে। এ মর্মে অনেক হাদীস রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

---

[৭] *সূরা ফাতির, আয়াত : ৫।*

[৮] *আল মিসবাহুল মুনীর ফী তাহযীব তাফসীর ইবনু কাসীর-৮৬৫।*

[৯] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ১৫৫-১৫৬*

[১০] *সূরা আল-বাকারা আয়াত: ২১৪*

[১১] *সূরা আল-'আনকাবূত আয়াত: ২-৩*

খাব্বাব বিন আর্‌ত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কা'বার ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের (দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার)গণের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হত।

এ (অমানুষিক নির্যাতনেও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে শরীরের হাড় পর্যন্ত গোশত ও শিরা-উপশিরা সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। এ (লোমহর্ষক নির্যাতন) তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে। তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযরামাউত (দুটোই জায়গার নাম) পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে না। অথবা তাঁর মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশঙ্কাও করবে না। কিন্তু তোমরা (ঐ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াহুড়া করছ।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ.

বর্ণনাকারী বলেন : আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেনঃ : নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমতাবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো পাপই থাকে না।[১৩] সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দু'জনের হয়ে থাকে। আমি বললাম : এটা এজন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে কোনো মুসলিমের ওপর কোনো কষ্ট বা রোগ-ব্যাধি হলে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমনভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।[১৪]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহি বলেন : আমি চাই, আল্লাহ যেন আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদেরকে আল্লাহ নি'আমত দেয়ার পর তারা আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছে, বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষার সময় ধৈর্য ধারণ করেছে এবং গুনাহ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। কেননা এ ৩টি বিষয় একজন মানুষের সফলতার প্রতীক এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবির লক্ষণ। ▣▣

[১২] *সহীহ বুখারী হা: ৩৬১২*

[১৩] *তিরমিযী, হা ; ২৩৯৮*

[১৪] *সহীহ বুখারী হা: ৫৬৬০*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

সকল প্রকার হক যথাযথ আদায় করা

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم–بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً . فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا . فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا . فَقَالَ كُلْ . قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ . قَالَ فَأَكَلَ . فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ . قَالَ نَمْ . فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ . فَقَالَ نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ . فَصَلَّيَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « صَدَقَ سَلْمَانُ ».

অনুবাদ : আবু হুজাইফা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ﷺ সালমান ফারসী রাঃ এবং আবুদ্দারদা রাঃ-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। অতঃপর সালমান রাঃ আবুদ্‌দারদা রাঃ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে (তার স্ত্রী) উম্মুদ্দারদা রাঃ-কে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন : আপনার ভাই আবুদ্‌দারদার দুনিয়াতে কোনো প্রয়োজন নেই। ইতোমধ্যে অবুদ্‌দারদা রাঃ এসে গেলেন এবং সালমান রাঃ-এর জন্য খাবার তৈরি করে বললেন : খাও, আমি রোযাদার। সালমান রাঃ বললেন : তুমি না খেলে আমিও খাবো না। তখন তিনি খেলেন। রাত হলে আবুদ্‌দারদা রাঃ নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান রাঃ বললেন : ঘুমাও। তাই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার নামাযের প্রস্তুতি নিলে সালমান রাঃ বললেন : আরো ঘুমাও। অতঃপর রাতের শেষভাগে তিনি বললেন : এখন ওঠো। তখন তারা দু'জন (উঠে) নামায পড়লেন। এরপর সালমান রাঃ-তাকে বললেন : তোমার ওপর তোমার রবের হক আছে এবং তোমার ওপর তোমার নিজের হক আছে এবং তোমার ওপর স্ত্রীর হক আছে। তাই তুমি তাদের প্রত্যেককেই তাদের হক প্রদান করবে। পরে আবুদ্‌দারদা রাঃ নাবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে নাবী ﷺ বললেন : সালমান ঠিকই বলেছে।[১৫]

রাবী পরিচিতি : আবু জুহাইফাহ আস-সুআঈ আল-কূফী। তার নাম ওয়াহাব ইবনু আব্দুল্লাহ। তাকে ওয়াহাব আল-খাইর নামেও অভিহিত করা হয়। তিনি অল্প বয়স্ক সাহাবীদের একজন। নাবী ﷺ-এর মৃত্যুকালে বালেগ হননি। তিনি বয়সের দিক থেকে ইবনু আব্বাস রাঃ-এর সমসাময়িক ছিলেন। আলী রাঃ-এর খিলাফতকালে তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হন।

তিনি যাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন : তিনি সরাসরি নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আলী ইবনু আবু তালিব এবং বারা ইবনু আযিব রাঃ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন : আলী ইবনুল আকমার আল হাকাম ইবনু উতায়বাহ, সালামাহ ইবনু কুহায়ল, স্বীয় ছেলে আউন ইবনু আবু জুহাইকাহ এবং ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ প্রমুখ।

কথিত আছে যে, আলী রাঃ যখন খুতবাহ প্রদান করতেন তখন তিনি আলী রাঃ-এর মিম্বারের নিকট দাঁড়িয়ে থাকতেন। তার মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৭৪ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি ৮০ হিজরী সাল পর্যন্ত

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১৫] সহীহ বুখারী, হা : ৬১৩৯

জীবিত ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছয়টি গন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। সবশেষ তাঁর নিকট থেকে যিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ।[১৬]

হাদীসের ব্যাখ্যা :

آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ

নাবী ﷺ সালমান ফারসী এবং আবুদ্দারদা ﷺ-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, নাবী ﷺ সাহাবাদের মাঝে দু'বার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। প্রথমবার হিজরতের পূর্বে মক্কায় মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন পরস্পর সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে। যেমন তিনি যাইদ ইবনু হারিসাহ এবং হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন।

২য় বার হিজরতের পরে নবী ﷺ মদীনায় আসার পরে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে সালমান ﷺ এবং আবুদ্দারদার ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। সালমান ﷺ ছিলেন মুহাজির এবং আবুদ্দারদা ﷺ ছিলেন আনসারী। পরবর্তীতে সালমান ﷺ কুফাতে এবং আবুদ্দারদা ﷺ শামে বসবাস করেন।

فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ-অতঃপর সালমান ﷺ আবুদ্দারদা ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। আর সাক্ষাতের ঘটনা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই ছিল। এর প্রমাণ হাদীসের শেষাংশে রাসূল ﷺ-এর বাণী : **سلمان صدق** সালমান সঠিক বলেছে। যখন সালমান ﷺ আবুদ্দারদা ﷺ-এর বাড়ীতে উপস্থিত হন তখন আবুদ্দারদা ﷺ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তার স্ত্রী উম্মুদ্দারদার সাথে তার কথোপকথন হয়।

فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً তিনি আবুদ্দারদার স্ত্রী উম্মুদ্দারদাকে পুরাতন জীর্ণ কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। অর্থাৎ তার পোষাকে চাকচিক্য ছিল না। মহিলাগণ সাধারণত স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে সাজগোজ করে থাকে। ভালো পোষাক পরিধান করে। কিন্তু সালমান ﷺ উম্মুদ্দারদাকে এর ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। এই উম্মুদ্দারদার ﷺ নাম ছিল খাইরাহ বিনতু আবু হাদরাদ আসলামীয়াহ্। সাহাবীর কন্যা সাহাবীয়াহ। তিনি আবুদ্দারদা ﷺ-এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। আবুদ্দারদা ﷺ-এর আরেকজন স্ত্রী ছিল, তাকেও উম্মুদ্দারদা বলা হত। তার নাম ছিল হুজাইমাহ। তিনি তাবেঈ ছিলেন। তিনি আবুদ্দারদা ﷺ-এর পরেও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন এবং আবুদ্দারদা ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? অর্থাৎ সালমান ﷺ উম্মুদ্দারদা ﷺ-কে জীর্ণ পোষাক পরিহিত দেখে অবাক হলেন। তাই তার সাজগোজ পারিত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে উম্মুদ্দারদা বললেন :

أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا.

আপনার ভাই আবুদ্দারদার দুনিয়াতে কোনো প্রয়োজন নেই। দারকুতনীর এক বর্ণনায় আছে :

في نساء الدنيا তাঁর দুনিয়ার মহিলার কোনো প্রয়োজন নেই। ইবনু খুযাইমার বর্ণনাতে আছে **يصوم النهار ويقوم الليل** তিনি দিনে রোযা রাখেন আর সারারাত সালাতে ব্যস্ত থাকেন। তাই তার স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায়। যেহেতু তার স্ত্রীর প্রতি কোনো মনোযোগ নেই তাহলে আমি কার জন্য সেজেগুজে থাকবো?

فجاء أبوالدرداء فصنع له طعاما ইতোমধ্যে আবুদ্দারদা এসে গেলেন এবং সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। অর্থাৎ আবুদ্দারদা বাড়ীতে এসে সালমানের সাক্ষাৎ করলেন। তাকে স্বাগতম জানানোর পর স্ত্রী উম্মুদ্দারদাকে খাবার প্রস্তুত করতে বললে তিনি তা প্রস্তুত করার পর আবুদ্দারদা সালমানের সামনে তা উপস্থিত করে বললেন : **كل فإني صائم** আপনি খান, আমি সিয়ামরত অবস্থায় আছি। অর্থাৎ আমি নফল সিয়াম পালন করতেছি। সালমান ﷺ আবুদ্দারদা ﷺ-এর কথার প্রতি উত্তরে বললেন :

مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ আর আপনি না খেলে তো আমি খাবো না। ইমাম বুখারী ﷺ-এর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনু

[১৬] *সিয়ারে আ'লামুন নুবালা-৩/২০৩, ২০৪ পৃ.*

বাশ্‌শার সূত্রে বায্‌যারে বর্ণিত আছে যে, সালমান ﵁ আবুদ্‌দারদা ﵁-কে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বললেন أقسمت عليك لتفطرن : আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, অবশ্যই আপনাকে সিয়াম ভঙ্গ করতে হবে।

فأكل ফলে আবুদ্‌দারদা ﵁ খেলেন। অর্থাৎ আবুদ্‌দারদা ﵁ যখন দেখলেন যে, সালমান ﵁ নাছোড়বান্দা, তিনি না খেলে সেও খাবে না তখন তিনি সিয়াম ভঙ্গ করে সালমান ﵁ এর সাথে খেলেন।

فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ . قَالَ نَمْ অতঃপর যখন রাত হলো তখন আবুদ্‌দারদা ﵁ তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে চাইলে সালমান ﵁ বললেন, আপনি এখন ঘুমান অর্থাৎ আপনি এখন সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়েন। **فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ** অতঃপর রাত যখন শেষ প্রহরে উপনীত হল তখন সালমান ﵁ আবুদ্‌দারদা ﵁- কে বললেন : এখন আপনি উঠুন, অর্থাৎ এখন উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন।

فَصَلَّيَا তারা উভয়েই সালাত আদায় করলেন। অর্থাৎ রাতের শেষ প্রহরে তারা উভয়ে উঠে একসাথে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন।

وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا আপনার ওপর আপনার পরিবারেরও হক আছে। অর্থাৎ আপনার ওপর যেমন আপনার রবের হক রয়েছে, তেমনি আপনার নিজের শরীরের হক আছে। অনুরূপভাবে আপনার স্ত্রীরও হক রয়েছে।

فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ অতএব, প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য হক প্রদান করুন। আপনি যদি সারাদিন সিয়াম পালন করেন, আর সারারাত তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যস্ত থাকেন তাহলে তো আপনার স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবেন না। তাই আপনার স্ত্রীকে তার হক প্রদান করার জন্য আপনি রাতের একাংশ আপনার স্ত্রীর সাথে কাটাবেন। আপনার শরীরের হক আদায় করার জন্য রাতের কিছু সময় ঘুমাবেন আর আপনার রবের হক আদায় করণার্থে কিছু সময় সালাত আদায় করবেন।

فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ .

অতঃপর আবুদ্‌দারদা ﵁ নাবী ﷺ-এর নিকট এসে সালমান ﵁-এর সাথে ঘটে যাওয়া বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করলে নাবী ﷺ বললেন : **صَدَقَ سَلْمَانُ** সালমান ﵁ ঠিকই বলেছেন। অর্থাৎ সালমান ﵁ কোনো কিছু বাড়িয়ে বলেননি, তিনি যা বলেছেন যথার্থই বলেছেন।

হাদীসের শিক্ষা :

১. মুসলিমদের মাঝে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ।

২. বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে তথায় রাত যাপন করা শরীয়তসম্মত।

৩. প্রয়োজনে বন্ধুর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কথা বলা বৈধ।

৪. এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইকে উপদেশ প্রদান করা।

৫. কোনো মুসলিম ভাই শরীয়তের বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে সে বিষয়ে তাকে সতর্ক করা।

৬. শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার ফযীলত।

৭. স্বামীর উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সাজগোজ করা।

৮. স্ত্রীর সাথে স্বামীর রাত যাপন করা স্ত্রীর অধিকার।

৯. মোস্তাহাব কাজ করতে গিয়ে ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে মোস্তাহাব কাজে বাধা প্রদান করা বৈধ।

১০. প্রয়োজনে নফল সিয়াম ভেঙ্গে ফেলা বৈধ।

১১. নফল সিয়াম ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ওয়াজিব নয়। ▣▣

যে আমলে তাড়াতাড়ি সওয়াব পওয়া যায় :

আবূ হুরাইরাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর আনুগত্য করা হয় এমন আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি যে আমলের সওয়াব পাওয়া যায়, তা হল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। আর যে বদ আমলের শাস্তি সত্বর দেওয়া হয়, তা হল বিদ্রোহ, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া, যা দেশ-মাটিকে মরুময় করে তোলে। *(বাইহাকী, হা :২০৩৬৪, সহীহুল জামে, হা : ৫৩৯১)*

সম্পাদকীয়

দেশ পুনর্গঠন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে আসার আহ্বান

الافتتاحية

পৌনে দুশ' বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা অর্জন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, '৫২'র ভাষা আন্দোলন, সে সময় কারফিউ ভেঙে দুঃসাহসিক ছাত্র-জনতার মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তপ্ত তাজা রক্তে লাল রাজপথ, এমনকি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা অর্জন, লাল সবুজের পতাকার বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনন্দক্ষণ এ প্রজন্মের তরুণরা দেখতে পায়নি।

তবে তারা দেখলো ২০২৪-এর ৫ আগস্ট। এক নিষ্ঠুর, নৃশংস, নিপীড়ক সরকারের পতন। দাম্ভিকতা, গোপন আয়না ঘরের নিষ্ঠুর নির্যাতন, গুম, হত্যা, ভোটাধিকার হরণ, বাকরুদ্ধ করে শান্তিপ্রিয় জনগণকে বুলেটের মুখে বুটের নীচে চেপে ধরে ১৬ বছর যে নারকীয় শাসন অব্যাহত রেখেছিল বিগত সরকার, তা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবে দুরন্ত-নির্ভীক বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের স্রোতে খড়কুটার মতো ভেসে গেল নিমিষে, চূর্ণ হয়ে গেল সব অহঙ্কার।

এ সময়ের নতুন প্রজন্ম আবেগে, উচ্ছ্বাসে, আনন্দ মিছিলে দুঃশাসনের জগদল পাথরের চাপা থেকে বের হওয়ার সুখ মিছিলে সামিল হলো। এমন আনন্দ-উচ্ছ্বাস জীবনে একবারই দেখার সুযোগ হয়। সে দৃশ্য অভাবনীয়, অকল্পনীয় অভূতপূর্ব। নতুন স্বাধীনতা, নতুন বিপ্লব, নতুন বাংলাদেশ নতুন স্বপ্নে বুকবাঁধা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অর্জিত স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া, হরণ করা কথা বলার অধিকার, বাংলাদেশকে নতুনভাবে বিনির্মাণের ভাবনা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল সংস্কার, দেশকে মূল্যবোধে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়ার এক সম্ভাবনায় মুহূর্ত এখন। এখন খুলে গেছে বন্ধ থাকা সব দুয়ার, এখন সময় শুধু এগিয়ে যাবার। টেকসই সংস্কারের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সুশাসনসমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজ করে চলছে। ১৬ বছরের জঞ্জাল একদিনে সাফ হওয়ার নয়। সর্বত্র, সবকিছু তছনছ করে গেছে বিগত শাসক। দেশ গঠনে ছাত্র-জনতা রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন সবাই এগিয়ে এসেছে। এ অভিযাত্রায় আপামর জনতা সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের পাশাপাশি অরাজনৈতিক একটি প্রাচীন ও বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং এর অঙ্গ সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কর্মীবৃন্দ ও সমর্থকসহ সকল আহলে হাদীসদের তৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালে গঠিত নিখিলবঙ্গ জমঈয়তে আহলে হাদীস, পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক ভাবনা থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর কৌশলগত কারণে রাজনৈতিক তৎপরতাকে নিষ্ক্রিয় রেখে সংগঠনটি দাওয়াহ ও তাবলীগের কাজে বেশি সময় মনোযোগী ও তৎপর ছিল। গত জুলাই-এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর প্রেক্ষাপট পরিবর্তন এবং সময়ের দাবিতে এদেশের প্রায় ৪ কোটি আহলে হাদীস, দেশ পুনর্গঠন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সার্বিক সহোযোগিতা করে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও তা অব্যাহত রাখবে। তবে এক্ষেত্রে আহলে হাদীসদের অবশ্যই নিজেদের আকিদাহ ও ঐতিহ্য বজায় রেখেই অন্যদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে আহলে হাদীসদের মূল দাওয়াত "শিরক-বিদ'আত বর্জন করতঃ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ"ভিত্তিক সমাজ, জাতি ও দেশ গঠনের আহ্বান সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন।

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : সংকট ও নিরসন ভাবনা

প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

ভূমিকা

মানব সভ্যতার উন্মেষ থেকেই জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার সূচনা। আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশ হয় শিক্ষার। ইরশাদ হচ্ছে, **إقرأ باسم ربك الذي خلق** পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।[১৭] আল-কুরআনের এসব আয়াত শিক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। আর কুরআনিক শিক্ষা যেসব প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয় তাই মাদরাসা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। প্রায় নব্বইভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিকভাবেই দু'টি ধারা বিদ্যমান। ধর্মীয় শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষাধারা। অন্যটি সাধারণ শিক্ষাধারা। মাদরাসা শিক্ষাধারা আবার দু'টি ধারায় প্রবাহিত– আলিয়া ও কওমী বা দরসে নিযামী।

আলিয়া মাদরাসার সূচনা : বাংলাদেশে দু'প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা। মাদরাসা (আরবি : مدرسة, বহুবচনে مدارس) আরবি শব্দ درس দারসুন থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'পাঠ'। আরবী মাদরাসা শব্দের অর্থ পাঠশালা/স্কুল/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। মাদরাসা শিক্ষায় প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়েদ-বিন-আরকামের বাড়িতে। যেখানে স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ছিলেন তার কয়েকজন অনুসারী সাহাবী।

مدرسة (মাদরাসা) শব্দটি আরবী, একবচন। বহুবচনে **مدارس** (মাদারিস) **درس** (দরস) ধাতু হতে উৎকলিত। আরবী অভিধানগুলোতে দার্‌স (**درس**) শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- মিটিয়ে দেয়া, কাপড় পুরাতন হওয়া। শিক্ষা দেয়া, শিক্ষাদান করা, শিক্ষা গ্রহণ করা, পড়ানো, একনিষ্ঠতার সাথে মুখস্ত করানো, মিলন হওয়া, আটা পিষা, ঋতুস্রাবী হওয়া, একে অন্যকে পাঠ দেয়া, অংশগ্রহণ করা, কাপড় পুরাতন করা, খুশী হওয়া, পাঠ করা, বারংবার পড়া, মুখস্ত করা। চুলকানী হওয়া, অক্ষম হওয়া, গাঢ় মোটা হওয়া, হাড্ডী মোটা হওয়া, মাথা মোটা হওয়া, সভ্যতা, উটের শরীর মোটা হওয়া, তুলনা করা, বপন করা, কাপড় ছিঁড়ে যাওয়া, ঠিক হওয়া, সঠিক হওয়া, সমান হওয়া, ফিরে আসা, ঘষা-মাজা করা, সঠিক কথা বলা, দৃঢ় অঙ্গীকার করা, ব্যবস্থা করা, উটকে সোজা করা, পাপাচার করা, অপছন্দনীয় হওয়া, নির্ধারিত পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা, লোহা ঠিক করা, ইত্যাদি। অধ্যবসায়, চেষ্টা সাধনা পাঠ, পাঠন, বক্তৃতা, সবক, শিক্ষা, নসীহত, চশমা, দর্শন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ, গোপন রাস্তা, তরবারী বর্ম, মাথার আচ্ছাদন, খাদক, নিশ্চিহ্ন রাস্তা, উটের লেজ, ব্যায়াম, বিছানা, কর্মচারী, পাগল, লেকচার, ওয়াজ, বীর পুরুষ, সিংহ ইত্যাদি।

মাদরাসা স্থানবাচক বিশেষ্য। অর্থ পাঠশালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষায়তন ইত্যাদি। আর ইসলামী পরিভাষায় মাদরাসা শব্দটি মুলিমদের ধর্মীয় পাঠশালাকে বুঝায়। অর্থাৎ মাদরাসা হচ্ছে আরবি ভাষা ও ইসলামি শিক্ষাবিষয়ক অধ্যয়ন পঠন পাঠনের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণত শিশুকিশোরদের প্রাথমিক পর্যায়ের কুরআন মাজীদ, দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার স্থানকে মক্তব এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ইসলামী বিষয়াদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থানকে মাদরাসা বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হতে অদ্যাবধি এ শিক্ষাধারা অব্যাহত আছে।

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার বিকাশ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম মাদরাসা ছিল গারে সওর। এখানেই তিনি জিব্রীল মারফত ঐশী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শিক্ষক হওয়ার পর ৬১৪ সালে মক্কায় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ীতে সর্বপ্রথম "দারুল আরকাম" মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহিরাগত মুহাজির এবং মদীনার বাস্তুহারা শিক্ষার্থীদের অবস্থানের জন্য মসজিদে নববীর উত্তর-পূর্ব সংলগ্ন 'সুফ্‌ফা' নামক একটি আবাসিক মাদরাসা নির্মাণ করেন। এর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ, উবাদা বিন সামিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ জন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা মতে, সুফফা মাদরাসার ৭০ জন ছাত্র মদীনার বিভিন্ন মাদরাসায় সকাল পর্যন্ত পড়াশুনা করত। ইবনে

* ***প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান***- *আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও* ***উপদেষ্টা***- *বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৭] *সূরা আল-আলাক, আয়াত-১।*

সাদের মতে, মদীনায় 'দারুল কুররাহ' নামক একটি মাদরাসা ছিল এবং মদীনার আরো ৯টি মসজিদ শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হত। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদে নববী প্রস্তুত সম্পন্ন হলে নবী করিম ﷺ নিজেই এখানে শিক্ষাদান শুরু করেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখানে এসে ভীড় জমাতেন।[১৮]

বর্তমান যুগ : ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষানুরাগীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার শুরুর দিকে দরসে নিযামী কোর্স থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই আলিয়া মাদরাসাসমূহের সূতিকাগার হয়। ফলে এ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে এদেশে বহু আলিয়া মাদরাসা।

আলিয়া মাদরাসার সাথে সাধারণ শিক্ষার ব্যবধান : ব্রিটিশ সরকার সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা এ দু'ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কারণে সমাজে দু'ধরনের শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হয়। এদের এক শ্রেণী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তুবাদী ও জাগতিক বিষয়ে পারদর্শী অথচ জীবন ও জ্ঞান সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ। অপর শ্রেণী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু আধুনকি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তত ওয়াকিফহাল নন। প্রচলিত উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও ধর্মকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে এবং এ দু'টো একই উৎস থেকে উৎসারিত নয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুপস্থিত করা হয়েছে। অথচ শিক্ষার মূল উৎস আল-কুরআন বিশ্বের সকল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস।

আলিয়া মাদরাসার উন্নয়নে গঠিত বিভিন্ন কমিশন : আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মাদরাসা শিক্ষার সংযোগ করত পাহাড়সম বৈষম্য দূরীকরণে আলিয়া মাদরাসার উন্নয়নে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়। কম বেশি সকল কমিশনই আলিয়া মাদরাসার উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু কোনো কমিশনই এসব সুপারিশ হুবহু বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না। এভাবেই গত পৌনে একশ বছর চলে যায়। ১৯৪৯-৫১ সালের মওলানা আকরম খাঁর East Bengal Education System Reconstruction Committee, ১৯৫৬ সালের আশরাফউদ্দীন চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালের আতাউর রহমান শিক্ষা সংস্কার কমিশন, ১৯৫৮ সালের এম.এম শরীফ জাতীয়শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৩ সালের ড. এস. এম হোসাইনের Islamic Arabic University Committee, ১৯৬৯ সালের ইমামুদ্দীন চৌধুরীর Madrasae Review Committee, ১৯৭২-৭৩ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৩ সালের মাদরাসার শিক্ষা সংস্কার সংস্থা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ করে। ১৯৭৫ সালের কুদরত-ই-খুদা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে প্রফেসর মুস্তফা বিন কাসিমের নেতৃত্বে Senior Madrasah Education System Committee গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে কাসিম কমিটির সুপারিশের আলোকে সাধারণ শিক্ষার স্তরের সঙ্গে মাদরাসা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ঢেলে সাজানো হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে দাখিল এসএসসির সমমান হলে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এক দিগন্তকারী পরিবর্তন আসে। ২০০৬ সালে ফাজিল কামিল মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মাদরাসার মান সকলস্তরে সমমান হয়। মানের দিক থেকে উন্নয়ন হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে ফলে ফাযিল কামিল শ্রেণীতে ভাল মানের আশানুরূপ শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আলিয়া মাদরাসার কিছু উন্নয়ন হলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিষয়ের গুরুত্ব কমতে থাকে। এতে মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে থাকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (Educational Management) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনকে বোঝায়। শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অভ্যাস এবং মনোভাবকে শেখার অভিজ্ঞতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সব যেমন পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা পর্ষদ, শিক্ষক পর্ষদ এবং কর্মচারী পর্ষদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধান-অধ্যক্ষ/ হেডমাস্টার/ সুপার, শিক্ষকতা কর্মী, অশিক্ষক কর্মী, প্রশাসনিক কর্মী এবং অন্যান্য শিক্ষা পেশাজীবী সবই শিক্ষাব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (NAEM: National Academy for Educational Management,) বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি যেখানে সর্বস্তরের শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

[১৮] *আহদে নববী কা নেযামে তা'লীম ঃ ২৩৮।*

আলিয়া মাদরাসায় সংকট : মাদরাসাগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মাদরাসা শিক্ষিত লোক দায়িত্বে না থাকা এবং সবসময় সরকারের বিমাতাসূলভ আচরণের কারণে মাদরাসা শিক্ষা আজ অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। সর্বাঙ্গে ঘা ঔষধ দিব কোথা। মাদরাসা শিক্ষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু সংকট আর সমস্যা। মাদরাসা অধিদপ্তরসহ বোর্ডে কর্মরত ভিন্ন ধর্মের কর্মকর্তা, বোর্ডের সর্বোচ্চ পদসহ ১২টি পদে মাত্র একজন মাদরাসা শিক্ষিত কর্মকর্তা, মাদরাসাগুলোর ভৌত অবকাঠামোগত সংকট, শিক্ষা সংকট, শিক্ষার্থী সংকট, মানগত শিক্ষক সংকট, শিক্ষকদের পদোন্নতি সংকট, সামাজিক সংকটসহ অসংখ্য সংকট লেগেই আছে। এত স্বল্প পরিসরে সকল দিকভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।

প্রথমত ঃ মাদরাসা শিক্ষার অবনতির অন্যতম মূল কারণ হল শিক্ষা অব্যবস্থাপনা। মাদরাসার এমন অধ্যক্ষ আছেন যারা একই মাদরাসায় এবতেদায়ীতে ভীর্ত হয়ে কামিল পাস করেছেন। শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর তার কোনো ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ হয়নি। তাহলে এই শিক্ষক যদি অধ্যক্ষ হন তাহলে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের কী বুঝবেন ? কিভাবেই বা তিনি সকলকে ম্যানেজ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন? এ সংকট উত্তরণে প্রতিটি বিভাগীয় অঞ্চলে একটি করে মাদরাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : উভয় শিক্ষা ব্যবস্থাতেই মানুষের মধ্যে ইহ ও পরকালীন জীবনে সমন্বয় সাধন করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে দুনিয়ামূখী করে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে দুনিয়াত্যাগী মনোভাব পোষণের শিক্ষা প্রদানের কারণে এরা জাগতিক বিষয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এই মূল সমস্যার কারণে একজন নিম্ন পরিবারের অভিভাবক তার সন্তানকে মাদরাসায় পড়াতে চাচ্ছে না। এতে দিন দিন মাদরাসায় শিক্ষার্থী সংকট হচ্ছে।

তৃতীয়ত : দেশের ৬৫ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও একটি ইবতেদায়ী মাদরাসাও সরকারী নেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেভাবে খাদ্যসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তা ইবতেদায়ী মাদরাসায় নেই। তাই আলিয়া মাদরাসার ফিডার প্রতিষ্ঠান ইবতেদায়ী মাদরাসা হতে আশানুরূপ উচ্চ ক্লাসে শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলো সরকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থত : মাদরাসায় দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার সাথে মান এক হলেও তাদের ২০০-৫০০ নাম্বারের জন্য অতিরিক্ত কোর্স বেশি পড়তে হয়। এজন্য তারা দাখিল পাস করে কলেজে চলে যায়। ফলে মাদরাসায় আশঙ্কাজনকহারে শিক্ষার্থী হ্রাস পাচ্ছে। যুগে যুগে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের ফলে আলিয়া মাদরাসার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৭-২০০৬ সালের *Islamic University (Amendment) Act,* ২০০৬ মোতাবেক সাধারণ শিক্ষার সাথে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষা সমন্বিত করার কারণে ফাযিল (ডিগ্রী) ৩ বৎসর এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বৎসর মোট ৫ বৎসরের কোর্স চালু হয়। উক্ত অ্যাক্ট-অনুসারে ১০৮৬টি ফাযিল (স্নাতক) ও ১৯৮টি কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসা, মোট ১২৮৪টি মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীভুক্ত হয়। ২০১৫ সালে ফাযিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসাগুলো ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে ৭৯টি মাদরাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। ২০০৬ সালে ফাজিল কামিল মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মাদরাসার মান সকলস্তরে সমমান হয়। মানের দিক থেকে উন্নয়ন হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, ফলে ফাযিল কামিল শ্রেণীতে ভাল মানের আশানুরূপ শিক্ষার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। এতে মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

পঞ্চমত : আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষয়িক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই উভয় শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের হেয় করে দেখা হয়। যার কারণে তারা হীনমন্যতায় ভোগে। অতএব রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে সামনে রেখে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনেই শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। দেশের কল্যানের জন্য দু'ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। (চলবে ইনশা আল্লাহ)

বছরের বিভিন্ন সময়ে সিয়াম পালন : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উৎকৃষ্ট উপায়

প্রফেসর ড. মো: ওসমান গনী ❖

রোজা ফারসি শব্দ। শব্দটির আদি ইরানীয় ধাতুমূল রোওচাকাহ। অর্থ উপবাস। আরবিতে এই উপবাসের নাম সওম। বহুবচনে সিয়াম। সিয়ামের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ বা বিরত থাকা। এটি ইসলাম ধর্মের তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মূলভিত্তি। সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, পাপাচার, কামপ্রবৃত্তি ও ভোগবিলাস থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চমৎকার উপায়ও বটে।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিলো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।[১৯]

নবী ﷺ-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে জানা যায়, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সিয়ামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন : সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সে আমারই জন্য তার কামাচার এবং পানাহার বর্জন করেছে।[২০]

সিয়ামের ফাযায়েল প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী উদ্ধৃত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি জানান, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে কোনো বান্দা একদিন যদি সিয়াম পালন করে তবে সে দিনটি জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দেয়।[২১] আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, হাদীস সূত্রে অবগত হওয়া যায়, নবী ﷺ বলেন, ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোযা পালন করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।[২২]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, অনুরূপ একটি হাদীস পাওয়া যায়, নবী ﷺ বলেছেন, সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফা'য়াত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মেটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করো। নবী ﷺ এইসব সাওয়াবের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে সাংবাৎসরিক বিভিন্ন সময়ে রোযা রাখতেন। নিম্নে সে সকল সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. প্রতি চাঁদের তিনদিন সিয়াম পালন : রাসূল ﷺ বলেছেন : মাসে তিনদিন সিয়াম পালন কর, কারণ সাওয়াবের কাজের ফল দশগুণ, এভাবেই সারা বছর সিয়াম পালন করা হয়ে যাবে।[২৩] মুয়াজ আল আদাবিয়্যাহ رضي الله عنها নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা رضي الله عنها-এর কাছে জানতে চাইলেন, রাসূল ﷺ কি প্রতিমাসে তিনদিন সিয়াম পালন করতেন? জবাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি পুণরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন কোন দিন তিনি সিয়াম পালন করতেন? আয়িশা رضي الله عنها বললেন, তিনি মাসের যে কোনদিন সিয়াম পালন করতে দ্বিধা করতেন না।[২৪]

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলো- প্রতিমাসে তিনদিন সিয়াম পালন, দুই রাকা'আত সালাতুয যুহা (চাশতের সালাত) এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা।

❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১৯] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৩।

[২০] সহীহ মুসলিম হা : ২৫৭৪, তিরমিযী, হা : ৭৬২।

[২১] তিরমিযী, হা : ১৬২৯।

[২২] সহীহ বুখারী, হা : ১৯০১।

[২৩] সহীহ বুখারী হা : ১৮৪৭, সহীহ মুসলিম হা : ২৬০৩, নাসাঈ, হা : ২৪১৩, আবু দাউদ, হা : ২৪১৭।

[২৪] সহীহ মুসলিম, হা : ২৬১১, ইবনে মাজাহ, হা : ১৭০৯, আবু দাউদ, হা : ২৪৪৫।

২. আইয়্যাম বীযের সিয়াম :

আবুযর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়্যামে বীযের তিনদিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। দিনগুলো হলো : চাঁদের মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।[২৫]

৩. সপ্তাহের প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম :

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ওই দিন স্বীয় সিয়াম পালন করতেন। তিনি বলেন : মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়, সুতরাং আমি ভালোবাসি এজন্য যে, সায়িম অবস্থায় আমার আমলসমূহ দরবারে মাওলায় উপস্থাপিত হয়।[২৬] সোমবার সিয়াম পালনের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সোমবার আমি জন্মলাভ করেছি এবং এদিন আমার ওপর কুরআন সর্বপ্রথম নাযিল হয়।[২৭] হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জানান, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করতেন। দিনগুলো হলো : মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবার।[২৮]

৪. জুমু'আর দিনে সিয়াম :

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমুআর দিনে সিয়াম পালন না করে। তবে, জুমুআর একদিন আগে কিংবা পরের দিন সিয়াম পালন করে তাহলে জুমুআর দিনও পারে।[২৯]

৫. আশুরার সিয়াম :

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশুরার দিন সিয়াম পালনরত দেখতে পান। এতদদৃষ্টে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করে অবগত হন যে, মহান আল্লাহ এদিনে মুসা (আলাইহিস সালাম)-কে ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এদিন সিয়াম পালন করেছেন। দয়ার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভিমত, আমরা তো মুসা (আলাইহিস সালাম)-এর অধিকতর নিকটবর্তী এবং হকদার। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম পালন করলেন এবং তা করার জন্য নির্দেশ দিলেন।[৩০] উপরন্ত ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, আল্লাহ চাহেতো আগামী বছর দু'টি সিয়াম পালন করবেন। কিন্তু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে গমন করেন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাচনিক উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন, রামাযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো মুহাররম মাসের সিয়াম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ)।[৩১] আবু গিতফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্বৃতি সূত্রে জানান যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আশুরার দিন সিয়াম পালন করেন তখন আমাকেও ঐদিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। সাহাবিগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আগামী বছর সময় আসবে তখন আমরা ৯ মুহাররমসহ সিয়াম পালন করবো? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যখন আগামী বছর সময় আসবে তখন আমরা ৯ মুহাররমসহ সিয়াম পালন করবো।' আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইনতেকাল করেন।[৩২]

আশুরা সিয়ামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে দয়ার নবী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে পূর্ববর্তী এক বছরের পাপ ক্ষমা করবেন।[৩৩]

৬. শাবান মাসে সিয়াম :

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন : আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রামাযান ব্যতীত কোনো পুরো মাসের সিয়াম পালন করতে দেখিনি, শাবান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশি (নফল) সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি।[৩৪]

---

[২৫] *সহীহ বুখারী হা : ১৮৫২, নাসাঈ, হা : ২৪২৫, তিরমিযী, হা : ৭৫৯, আবু দাউদ, হা : ২৪৪১।*

[২৬] *আবু দাউদ, হা : ২৪২৮, তিরমিযী হা : ৭৪৫, ইবনে মাজাহ, হা : ১৭৪০, সহীহ মুসলিম হা : ৬৩১৪।*

[২৭] *আবু দাউদ, হা : ২৪১৮, মুসলিম হা : ২৬১৪।*

[২৮] *আবু দাউদ, হা: ২৪৪৩, নাসাই, হা : ২৩৬৫।*

[২৯] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৫৭, মুসলিম হা : ২৫৫০, তিরমিযী, হা: ৭৪১, ইবনে মাজাহ, হা : ১৭২৩, আবু দাউদ, হা : ২৪১২।*

[৩০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৭০, সহীহ মুসলিম, হা : ২৫২৫, আবু দাউদ, হা : ২৪৩।*

[৩১] *সহীহ মুসলিম হা : ২৬১, তিরমিযী, হা : ৭৩৮।*

[৩২] *আবূ দাউদ হা : ২৪৩৮, সহীহ মুসলিম হা : ২৫০৩, তিরমিযী হা : ৭৫২, ইবনে মাজাহ, হা : ১৪০৬।*

[৩৩] *আবু দাউদ, হা : ২৪১৭, মুসলিম, হা : ২৬১৩, তিরমিযী, হা : ৭৫০, আবু দাউদ, হা : ২৪১১।*

[৩৪] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৪০, সহীহ মুসলিম, হা : ২৫৮৮,*

৭. রামাযান মাসের সিয়াম :

রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসের সিয়াম পালন করে, তার আগের কৃত সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৩৫] তিনি আরো বলেছেন : রামাযান মাসের সিয়াম এক রামাযান হতে অন্য রামাযান পর্যন্ত সারা বছর সিয়াম পালন করার সমতুল্য।[৩৬]

৮. শাওয়াল মাসের সিয়াম :

রমাযান মাসের সিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছরের সিয়াম পালন করার মতো।[৩৭]

৯. জিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন :

রাসূল ﷺ জিলহজ্জের প্রথম নয়দিন ও আশুরার দিন সিয়াম পালন করতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিন দিন, মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন।[৩৮]

১০. আরাফার দিবসে সিয়াম :

রাসূল ﷺ বলেন, আরাফার দিনের সিয়াম আমি আল্লাহর নিকট এরূপ প্রত্যাশা করি যে, এর বিনিময় তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের এবং পরবর্তী একবছরের যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দিবেন ।[৩৯]

১১. দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম :

এতদ্ব্যতীত রাসূল ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম সিয়াম হলো আমার ভাই দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন তা ত্যাগ করতেন।[৪০]

আবু দাউদ, হা : ২৪২৩. নাসাঈ, হা : ২১৮৪।

[৩৫] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৮২, ইবনে মাজাহ, হা: ১৬৪১, সহীহ মুসলিম, হা : ১৬৫১।*

[৩৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬১০, আবু দাউদ, হা : ২৪১৫।*

[৩৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬২৫, তিরমিযী, হা : ৭৫৭, ইবনে মাজাহ, হা : , আবু দাউদ, হা : ২৪২৫।*

[৩৮] *আবু দাউদ, হা : ২৪২৯, নাসাঈ, হা : ২৪১৯।*

[৩৯] *আবু দাউদ, হা : ১৪১৭।*

[৪০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৪৭ সহীহ মুসলিম, হা : ২৬০৭, তিরমিযী, হা: ৭৬৮, ইবনে মাজাহ, হা ১৭১২।*

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে ভালোবাসেন। কৃত গুনাহ ক্ষমা লাভের উপায় ও পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সন্তোষ অর্জনের জন্য সিয়াম সাধনার সবিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কেননা, তিনি বলেন, 'এর বদলা আমিই দেব'- অর্থাৎ বিশাল ভাণ্ডারের মালিক, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী তার প্রতিশ্রুত বদলা কী হতে পারে? হ্যাঁ, পাঠকমণ্ডলী, তাঁর বদলা হবে জান্নাত। অনন্তকাল ধরে সে জান্নাতে বাস করবে। ওই জান্নাতের সবচাইতে যেটি ছোট সেটিও দশ দুনিয়ার সমান।[৪১] আসুন আমরা ওই প্রতিশ্রুত জান্নাত লাভের জন্য সাগ্রহে সিয়াম সাধনায় লিপ্ত হই। হে আল্লাহ! তুমি তা পালনের জন্য আমাদের শক্তি ও সাহস দান করো। আমীন॥ ❑❑

সওম পালনকারীর জন্য রাইয়্যান।

عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে। *(সহীহ বুখারী, হা : ১৮৯৬, সহীহ মুসলিম-১৩/৩, হা : ১১৫২)*

---

[৪১] *সহীহ বুখারী, হা : ৬৫৭১, সহীহ মুসলিম, হা : ১৮৬।*

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(পূর্ব প্রকাশের পর থেকে)

আমরা পূর্বে দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মহান মর্যাদা এবং হুকুম বা বিধান সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এতেই প্রমাণিত হয় দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য। ইসলামী শরীয়ায় দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ একটি অপরিহার্য বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বিভ্রান্ত মানব জাতিকে দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অসংখ্য নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবুওয়াত ও রিসালাতের মূল কর্মসূচি হল দা'ওয়াহ ও তাবলীগ। এ দা'ওয়াহ তাবলীগ না হলে যেন রিসালাতের দায়িত্বই পালন হল না, আল্লাহ তা'আলা এমনটাই বলেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর যদি তুমি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।[৪২]

একইভাবে দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ না থাকলে শ্রেষ্ঠ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বও থাকে না। দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাঝেই রয়েছে উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের আগমন হয়েছে মানুষের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করবে, আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হবে।[৪৩]

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ না থাকলে মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে, বিপথগামী হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا .

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমালঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মত, যারা কুরআর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায়, আর কেউ নীচতলায়, (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচ তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপর তলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নীচতলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তাহলে ভাল হত), এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তখন তারাসহ সকলেই রক্ষা পাবে[৪৪]।

দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হবে। এমনকি মানুষ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেও দু'আ কবুল হবে না।

❖ সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জামি'আ মানারুত দাওহীদ, উত্তরা ঢাকা।

[৪২] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত : ৬৭।

[৪৩] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১০।

[৪৪] সহীহ বুখারী, হা : ২৪৯৩।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ "

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেছেন : সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শিগগিরই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি প্রেরণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন না[৪৫]।

অতএব দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এতই অপরিসীম যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও দা'ওয়া ইলাল্লাহ-এর গুরুত্ব বর্ণনায় বলা যায় যে,

❖ ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে বা পৌঁছে যাবে। আর ইসলাম পৌঁছে দেয়ার মূল মাধ্যম হলো দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ।

❖ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাধ্যমেই মানুষ ইসলাম জানার সুযোগ লাভ করেছে। তাওহীদসহ দীনের সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। দা'ওয়াহ না হলে তা সম্ভব ছিল না।

❖ ইসলামবিরোধী ও বিদেষী প্রচারণা মানুষকে ইসলামের বিষয়ে অন্ধকারে রাখে, তখন দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাধ্যমেই ইসলামবিরোধী বিষয়ের প্রতিরোধ করা এবং সঠিক ইসলাম তুলে ধরা সম্ভব হয়।

❖ সমাজে বাতিল আকীদা ও ইসলাম গর্হিত বিষয়সমূহ ছড়িয়ে রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাধ্যামেই সঠিক আকীদা প্রতিস্থাপন করা এবং ইসলামের সঠিক বিষয়গুলো তুলে ধরা সম্ভব। ফলে মানুষ ইসলামে দেক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

❖ একমাত্র দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ-এর মাধ্যমেই নব্যুয়াত ও রিসালাতের আমানত সংরক্ষণ এবং আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মানুষ জীবন বাঁচানোর তাকিদে পানাহারের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তার চেয়ে বহু বহু গুণে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শরীয়তের। কারণ পানাহারের অভাবে হয়ত মানুষের দেহের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু দীন ও শরীয়তের অভাবে মানুষের দেহ আত্মা সবকিছুই বিনাশ হয়ে যায়, বিপর্যয় নেমে আসে গোটা বিশ্বে। সুতরাং মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও গোটা বিশ্বের কল্যাণের জন্য পরিহার্য হলো ইসলামী শরীয়াহ। আর এ শরীয়াহ পাওয়ার মাধ্যম হলো দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ।[৪৬]

অতএব দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ ইসলামে একটি মহান বিষয় এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ***চলবে ইনশাআল্লাহ***

আল্লাহর তাওহীদের দিকে উম্মাতের প্রতি নাবী (ﷺ)-এর আহ্বান।

১. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বললেন : হে মু'আয! তোমার কি জানা আছে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী (ﷺ) বললেন : বান্দা আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। (আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন) আল্লাহর উপর বান্দার হক কী তা কি তুমি জান? তিনি বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি [নবী (ﷺ)] বললেন : তা হল বান্দাদেরকে শাস্তি না দেয়া। ***(সহীহ বুখারী, হা : ৭৩৭৩)***

২. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, এক লোক অন্য এক লোককে বারবার 'ইখলাস' সূরা তিলাওয়াত করতে শুনল। সকাল বেলা লোকটি নবী (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করল; লোকটি যেন সূরা ইখ্লাসের গুরুত্বকে কম করছিল। এই প্রেক্ষিতে নবী (ﷺ) বললেন : যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি! এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। ***(সহীহ বুখারী হা : ৫১৩)***

[৪৫] *তিরমিযী, হা : ২১৬৯, মুসনাদ আহমাদ, হা: ২৩৩১২ (হাসান)।*

[৪৬] *মিফতাহু দারুস সা'আদাহ-২/২ পৃ.।*

আল-কুরআনে মানুষ : মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

(পর্ব-০২)

১. ইতিবাচক দিক :

এক. মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফা

খলিফা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী।[৪৭] মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে মানুষকে স্বীয় খলিফা মনোনীত করেছেন। যেন তারা দুনিয়া তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এ মর্মে সৃষ্টির প্রারম্ভেই তিনি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দিয়েছেন :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

‘স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি; তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যারা অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জান না।’’[৪৮] তিনি (আল্লাহ) শুধু খলিফা হিসেবেই সৃষ্টি করেননি; বরং তাদেরকে পরীক্ষার জন্য একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

‘‘তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।’’[৪৯] এছাড়াও খলিফা হিসেবে একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিদ্ধত করতে গিয়ে তিনি তাঁর মনোনীত বান্দা দাউদ আলাইহিস সালাম-কে লক্ষ্য করে বলেন: ‘‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করিও না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।[৫০] এখানে প্রতিনিধি হিসেবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রমাণিত করতে হলে তাঁর আইনকেই শুধু মানুষের মাঝে পরিচালিত করতে হবে অন্যথায় তা হবে ব্যক্তিপুজা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর দাউদ আলাইহিস সালাম এ ধরনেরই একজন শাসক ছিলেন।

দুই. সর্বশ্রেষ্ঠ নি‘আমত জ্ঞানের অধিকারী : মানুষ বোধশক্তিসম্পন্ন প্রাণী। মহান আল্লাহ মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার সাহায্যে ভাল ও মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য সূচিত করা যায়। এ জ্ঞান দ্বারাই মানুষ ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে। অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ সকল প্রাণীর সেরা। পবিত্র কুরআনে এসেছে :

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ

---

* বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

[৪৭] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা- চতুর্থ সংস্কার-২০০২, পৃ. ৩২২।

[৪৮] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩০।

[৪৯] সূরা আন‘আম, আয়াত : ১৬৫।

[৫০] সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ২৬।

بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর ফেরেশতাদের সামনে সেগুলো প্রকাশ করলেন এবং বললেন 'এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন 'হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও'। সে তাদেরকে এ সবের নাম বলে দিল।"[৫১] জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ প্রভুত কল্যাণের অধিকারী হয়েছে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বারবার জ্ঞান আহরণে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বলা হয়েছে-মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে।[৫২] তিনি আরো বলেন :

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের আত্মাকে নিয়ে নেন, আর দিনের বেলা যা তোমরা কর তা তিনি জানেন। অতঃপর দিনের বেলা তিনি তোমাদের জাগিয়ে দেন, যাতে জীবনের নির্দিষ্টকাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তার পানেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন"[৫৩]

তিন. মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন : মানুষ সাধারণত স্বাধীনচেতা ও মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় চলা-ফেরা করতে পছন্দ করে। কিসে কল্যাণ এবং কিসে তাদের অকল্যাণ তা জ্ঞাত হবার পরও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা। মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া পয়গম্বরী মিশন পরিচালনার প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে মানব জীবন বিমন্ডিত। তারা দায়িত্বশীল জীব। উদ্যোগ ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মানুষের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। সমৃদ্ধি বা বিপর্যয় যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ায় তার রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। হয় সে সঠিক পথে চলে সমৃদ্ধির পানে বাড়বে অথবা অকৃজ্ঞ হয়ে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।[৫৪]

চার. মহত্ব ও মর্যাদার বিভূষিত : জন্মগতভাবেই মহত্ব ও মর্যাদার গুণাবলীতে মানুষ বিভূষিত। বাস্তবেই আল্লাহ অপরাপর অসংখ্য প্রাণীর ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সে তার আসল সত্ত্বাকে তখনই আবিষ্কার করতে পারে, যখন সে তার মহত্ব ও মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং নিজকে সকল নীচতা, দাসত্ব, অধীনতা ও ভোগ লালসার উর্ধ্বে স্থাপন করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম

[৫১] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩১-৩৩।*
[৫২] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬৯।*
[৫৩] *সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৬০।*
[৫৪] *সূরা আল-ইনসান, আয়াত : ২-৩।*

রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর মানুষদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৫৫]

পাঁচ. নৈতিক চেতনাবোধসম্পন্ন : মানুষের নৈতিক চেতনা আছে। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ভালো আর মন্দ বুঝে নিতে পারে। কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। মানুষের সত্তার মাঝেই এ সুপ্ত নৈতিক চেতনা লুকিয়ে আছে। কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

"শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। তাকে (মানুষকে) তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।[৫৬]

ছয়. আল্লাহর স্মরণে মানসিক প্রশান্তি লাভ : আল্লাহ স্মরণ ব্যতীত মানুষের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা সীমাহীন। তথাপি কোনো কিছুর আধিক্য তাদের মধ্যে একঘেয়েমীর সৃষ্টি করে। আধিক্য লাভে তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বিপরীত দিকে মহান আল্লাহর চিরন্তন সত্তার সাথে মিলনের পথে তারা যত এগিয়ে যায়, তাদের ব্যগ্রতা আরো বেড়ে যায়। মহান আল্লাহর স্মরণ মানুষকে এসব ক্ষেত্রে একমাত্র প্রশান্তির পায়রা হয়ে আবর্তিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[৫৭] অতএব, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং মানুষের প্রশান্তির অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর যিকির।

সাত. আল্লাহর ইবাদত পালনকারী : আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করার নিমিত্তে। এটাই তাদের প্রধান দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমার ইবাদতের জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং জ্বীনকে"।[৫৮] কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদত না করে এবং তাঁর সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা না করে তাহলে তারা নিজেদের চিনতে পারবে না। আল্লাহর ব্যাপারে গাফেল হলে তারা নিজেদেরও ভুলে যাবে। এ পরিস্থিতিতে তারা বুঝতে পারবে না তাদের নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে; তাদের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাও ভুলে যাবে। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে ধমকের সুরে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে; ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী।"[৫৯]

আট. পরকালীন সফলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান : মানুষ বড় জাগতিক প্রেরণা বা উদ্দেশ্য নিয়েই বাঁচে না। অর্থাৎ বস্তুগত চাহিদা বা প্রয়োজনই মানুষের সকল কর্মের পেছনে একমাত্র প্রেরণা নয় বরং তারা মহত্তর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। আর তা হলো পরকালীন সফলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান। অতএব, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাদের সামনে আর কোনো লক্ষ্যই থাকে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে মহাবাণী :

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

[৫৫] *সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৭০।*
[৫৬] *সূরা আশ-শামস, আয়াত : ৭-৮।*
[৫৭] *সূরা আর-রা'দ, আয়াত : ২৮।*
[৫৮] *সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬।*
[৫৯] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ১৯।*

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৬০]

নয় : মজবুত ঈমান :

ঈমান মানে বিশ্বাস, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস[৬১] অন্তরের বিশ্বাস।[৬২] এক কথায় বলতে গেলে ঈমান হচ্ছে : স্বীকৃতি প্রদান। পরিভাষায় : ইসলামের মূল বিষয়গুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার নাম ঈমান। মানুষের মধ্যে এমন কতক মানুষ আছে যারা আল্লাহ তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থাবলী ও সদৃশ্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে। কোনো অত্যাচারী শাসকের রক্তচক্ষু ও তাদের বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। এমন ঈমানের এক জীবন্ত মডেল হিসাবে বিশ্বের বুকে সমাদৃত রয়েছেন, মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসূল ﷺ এর প্রতি তাঁর এতো বেশি অগাধ আস্থা ছিল যে, মিরাজের ঘটনার বিবরণ শোনামাত্রই তিনি তা বিশ্বাস করে ফেলেন। পবিত্র কুরআন মানুষকে দু'ভাবে ভাগ করেছে। ১. ঈমানদার ২. যারা ঈমান আনেনি এমন। তবে যারা ঈমান আনে তাদের অধিকাংশই মজবুত ঈমানের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তারা বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত হতে বাধ্য। তাইতো এরশাদ হয়েছে : যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; অতঃপর অবিচলিত থাকে তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে তোমার ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।"[৬৩] এ ধরনের ঈমানের অধিকারী যারা তারাই সফলকাম ও বিজয়ী হবে। তাদের জন্যেই মহান আল্লাহ পরকালে মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিত হইও না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৬৪]

দশ. দরিদ্র অথচ অল্পে তুষ্ট : সমাজে দু'শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এক. ধনী, দুই. দরিদ্র। ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য দূরীকরণার্থে ইসলামে যাকাতের বিধান রয়েছে যা ধনীদের সম্পদ থেকে উত্তোলন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করতে হয়। কেননা ইসলাম সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এতে যাকাতের বিধান রাখা হয়েছে যেন সম্পদ এক শ্রেণীর হাতে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

'যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।'[৬৫] এতদসত্ত্বেও এমন কতিপয় মানুষ রয়েছে যারা অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করে। তথাপিও মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানায় না। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

'দান সাদকা তো ঐসব গরীব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফিরা করতে পারে না, অথচ লোকেরা হাত না পাতার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।[৬৬] মূলত অল্পে তুষ্টতাই শান্তির নিয়ামক। রাসূল ﷺ বলেন : **الغنى غنى النفس** 'অন্তরের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।'[৬৭]

চলবে ইনশাআল্লাহ

---

[৬০] *সূরা আল-ফাজর, আয়াত : ২৭-৩০।*
[৬১] *ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।*
[৬২] *মুফতী আমীমুল ইহসান, কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ. ২০০।*
[৬৩] *সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত : ৩০।*
[৬৪] *সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৩৯।*
[৬৫] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭।*
[৬৬] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৭৩।*
[৬৭] *সহীত মুসলিম, হা : ১০৫১।*

যুক্তিবাদের অজ্ঞতা সংশয় ও সমাধান

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-০৪)

সংশয়- ০৬

আল্লাহ তা'আলা তো জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সম্পর্কে জানেন, তাহলে তিনি মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ না করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করালেন না কেন?

অর্থাৎ আল্লাহ তো জানেন কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী, তার জানা অনুযায়ী তিনি কাউকে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে দিতে পারতেন, তা না করে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নানাবিধ বিপদাপদের মধ্যে নিমজ্জিত করলেন কেন?

সমাধান :

নাস্তিক্যবাদ কর্তৃক উল্লেখিত সংশয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তির কাছে যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সংশয়টি আমার কাছে অজ্ঞতাপূর্ণই মনে হয়েছে। কারণ নাস্তিকদের দাবি অনুযায়ী যদি এমনটি করা হতো তাহলে পরীক্ষার আগেই ফলাফল প্রদান আবশ্যক হয়ে যেতো।

ধরুন : কোন স্কুল কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের জ্ঞাতসারে ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষার আয়োজন না করে ছাত্রদের মেধা অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণা করলেন এবং ১০০ জন ছাত্রদের মধ্যে ৪০ জনকে এ প্লাস (A+), ৪০ জনকে এ মাইনাস (A-), ও ২০ জনকে অকৃতকার্য (failed) করে দিলেন। বলুন তো!! এ ফলাফল কি ন্যায়সঙ্গত হবে? ন্যূন্যতম বুদ্ধি রাখে এমন কোনো মানুষ কি এ ফলাফলকে ন্যায়সঙ্গত বলবে? শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ কি এ ফলাফল মানবে? মোটেও নয়। যারা অকৃতকার্য তারা বলবে, আমাদের মেধা কম থাকলেও কঠোর পরিশ্রম করে ভাল পরীক্ষা দিয়ে আমরা অবশ্যই ভাল রেজাল্ট করতাম। এ মাইনাসধারীরা বলবে, আমরা আরো ভালো পরীক্ষা দিয়ে আরো ভালো ফলাফল করতে পারতাম। আর এ প্লাসধারীরা বলবে পরীক্ষাবিহীন এ ফলাফল আমরা মানি না, কারণ এতে কোনো কৃতিত্ব ও আনন্দ কোনোটাই নেই। অর্থাৎ সর্বস্তরের ছাত্রদের কাছে এমন ফলাফল প্রত্যাখাত, ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষকে দুনিয়ায় না প্রেরণ করে সরাসরি জান্নাত কিংবা জাহান্নামে দিতেন, তাহলে সমস্ত জাহান্নামবাসীর বলার সুযোগ থাকতো, আমরা কঠোর পরিশ্রম করে উত্তম আমল করতাম এবং কখনই মন্দ আমল করতাম না এবং জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতাম। আল্লাহ আমাদের সে সুযোগ না দিয়ে আমাদের প্রতি যুলুম করেছেন এবং অন্যায়ভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। আবার জান্নাতবাসীদের যারা নিম্নস্তরের বাসিন্দা হতো তাদের এটা বলার সুযোগ থাকতো যে, আল্লাহ আমাদের জান্নাতের নিম্নস্তরে স্থান দিয়ে যুলুম করেছেন, আমরা অবশ্যই উঁচুস্তরের যোগ্য ছিলাম, অথবা ভাল কর্ম করে উঁচুস্তরের যোগ্য হতে পারতাম, আল্লাহ আমাদের সে সুযোগ না দিয়ে আমাদের প্রতি যুলুম করেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নামবাসী সবার কাছে আল্লাহ তা'আলা যুলুমকারী হয়ে যেতেন। (নাউযুবিল্লাহ)

অথচ আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও অন্যায় থেকে চিরমুক্ত তিনি বলেন :

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما .

নিশ্চয় আমি নিজের ওপর যুলুম করা হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি।[৬৮]

আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না বিধায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে যাচাই-বাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আর মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো প্রতিনিধি নিয়োগ করা বা দায়িত্বশীল নিয়োগ

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৬৮] সহীহ মুসলিম হা : ২৫৭৭।

করা, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

নিশ্চয় আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবো।[৬৯]

নাবী ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

নিশ্চয় দুনিয়াটা চাকচিক্যময় ও সুমিষ্টি ফলের মতো আকর্ষণীয়, আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য রাখছেন কিভাবে তোমরা কর্ম সম্পাদন কর।[৭০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জ্বিন এবং মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদত করার জন্য।[৭১]

-আর এ দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের ওপর অবিচল রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি যুগে নাবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন, যাতে কেউ জান্নাতে যাওয়া কিংবা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ না করতে পারে। যাচাই করার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করাটাই সর্বোচ্চ নীতিসংগত ও ইনসাফপূর্ণ, এতে কোনো ধরনের সংশয় প্রকাশ করা নীতিবিরুদ্ধ।

সংশয়-০৭ :

আল্লাহ তা'আলা লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন!! নাস্তিকরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এ মিথ্যা অভিযোগটি বরাবরের মতো করে থাকে।

তাদের বক্তব্য হলো : আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার কথা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, দুনিয়ার সমস্ত কাফির ও মুশরিক চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। অথচ দুনিয়ার মানুষের গড় আয়ু ৬০/৭০/৮০ বছর, সে হিসাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া থেকে হিসাব করলে একজন কাফির কিংবা মুশরিক সর্বোচ্চ ৫০/৬০ কিংবা ৭০ বছর শিরক করেছে। আর এ অল্প কয়েক বছরের অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দেওয়াটা অন্যায় নয়? এরপরও তোমরা মুসলিমরা আল্লাহকে ন্যায় বিচারক হিসাবে মান্য কর কিভাবে? (আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহী)

সমাধান :

প্রথমত : এ ধরনের সংশয় প্রকাশ করা একেবারেই অযৌক্তিক, কারণ অপরাধের সময়কালের ওপর ভিত্তি করে কখনই শাস্তির বিধান প্রণীত কিংবা বাস্তবায়িত হয় না। বরং অপরাধের মাত্রা, প্রখরতা ও তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে শাস্তির বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়। আর এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা বলুন তো! কোনো ধর্ষকের শাস্তি যদি ধর্ষণের সময়কাল অনুযায়ী দেওয়া হয়, অর্থাৎ ধর্ষণ করতে যদি ১০ মিনিট সময় লাগে তাহলে তাকে ১০ মিনিট জেল দিলে কি মানবেন?? কোনো বড় শিক্ষিত চোর যদি একবার স্বাক্ষর করার মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা চুরি করে থাকে, আর স্বাভাবিকভাবেই একবার স্বাক্ষর করতে সময় লাগে মাত্র ৫ সেকেন্ড, তাহলে কি বলবেন এতবড় চোরের শাস্তি শুধু ৫ সেকেন্ড জেল হবে! এমন হাস্যকর কথা রাস্তার পাগলও তো মানবে না। তাহলে আল্লাহর শানে কেন বলছেন যে, কয়েক বছরের শিরকের জন্য তিনি চিরস্থায়ী জাহান্নাম দিবেন কেন?

সুতরাং অপরাধের সময়কাল বিচারে শাস্তি বিধান বাস্তবায়ন করা মোটেও স্বাভাবিক নয় বরং এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও হাস্যকর। অপরাধের শাস্তিবিধান অপরাধের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।

শিরক এবং কুফর এতটাই জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ; যেমন কেউ যদি পিতার ঔরসে জন্মলাভ করার পরও পিতৃত্বের সকল অবদানকে অস্বীকার করে এবং মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করার পরও মাতৃত্বের সমস্ত অবদান অস্বীকার করে, সে যেমন সমাজের চোখে সব থেকে জঘন্যতম অপরাধী, তার থেকেও

[৬৯] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৩০।*
[৭০] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৭৪২*
[৭১] *সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬।*

শতগুণ বেশি অপরাধী হলো কাফির এবং মুশরিক। কারণ শিরক করার মাধ্যমে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং কুফরি করার মাধ্যমে সে আল্লাহর ক্ষমতা, বিধানাবলী ও সকল অবদানকে অস্বীকার করেছে। বিধায় সে আল্লাহর আদালতে সব থেকে জঘন্যতম অপরাধী, সে কারণে তার শাস্তিও সর্বোচ্চ; চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

দ্বিতীয়ত : কারো দেহে যদি ডায়বেটিস রোগ বাসা বাঁধে তাহলে এটা পরিক্ষা করার জন্য দেহের সমস্ত রক্তের প্রয়োজন পড়ে না, মাত্র এক ফোঁটা রক্ত হলেই ডায়বেটিসের মাত্রা কত তা নির্ণয় সম্ভব। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো ব্যক্তির চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া না হওয়া যাচাই করার জন্য হাজার কিংবা লক্ষ বছর হায়াত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার সমস্ত অপরাধ সম্পর্কে জানা আল্লাহ তা'আলার কাছে অতি সহজ একটি বিষয়। কুরআনুল কারীম বলেছে :

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

'সর্বোত্তম উপমা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৭২]

সুতরাং কাফির-মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। দুনিয়াতে শত শত নয় লক্ষ লক্ষ বছর আয়ু পেলেও তারা শিরক ও কুফরির ওপর অটল থাকতো। এমনকি তাদেরকে দুনিয়াতে বারংবার প্রেরণ করলেও তাদের অবস্থা একই হবে; আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

তাদের পৃথিবীতে পুনরায় ফেরত পাঠালেও তারা তাই করবে, যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে, নিশ্চয় তারা মিথ্যুক।[৭৩]

সংশয়-০৮ :

কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিষয়ের নামে শপথ করেছেন, এটার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর বিভিন্ন বস্তুর নামে শপথ করার দ্বারা কি এটা প্রমাণিত নয় যে, আল্লাহর কথার মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে? আর এজন্য তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি বিভিন্ন বস্তুর নামে কসম করেছেন?? (আস্তগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি)

সমাধান :

নাস্তিক্যবাদের এটাও একটি বড় সংশয় ও প্রশ্ন, এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করার পর নাস্তিকরা হয়তো খুব আনন্দবোধ করে এই ভেবে যে, স্রষ্টার বিরদ্ধে বড় একটা অভিযোগ করলাম!! কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে, কত বড় আহম্মকি করলো ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলো তারা।

মূলত আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার সৃষ্টিকুলের কাছে কোনোকিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

কোনো দর্জির কাছে আপনি জামা বানাতে দিলেন, এরপর দর্জি দক্ষতার সাথে সে জামা আপনাকে বানিয়ে দিল, আপনি সে জামা পরিধান করার পর দর্জিকে প্রশ্ন করে বলছেন, এ সুন্দর জামা যে আপনি বানিয়েছেন এর প্রমাণ দিন!! এটা যেমন হাস্যকর ও নির্বুদ্ধিতা ঠিক তেমনই আল্লাহর কথার সত্যতার প্রমাণ তালাশ করাও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্বই আল্লাহর কথার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। ওপরে স্থাপিত মজবুত আসমান তাঁর কথার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বন-জঙ্গলসহ সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব তার কথার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য সৃষ্টির নামে তাঁর শপথ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির যে কোনো কিছুর নামে শপথ করতে পারেন, আর এটাই তাঁর পালনকর্তা, মা'বুদ ও স্রষ্টা হওয়ার প্রমাণ। যেহেতু পৃথিবীর সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় তিনি যার নামে ইচ্ছা তার নামেই কসম করতে পারেন। এতে তার সত্যবাদিতা প্রমাণের কিছুই নেই। তিনি কুরআনুল কারীমে যে বস্তুগুলোর শপথ করেছেন, শপথ করার মাধ্যমে উক্ত বস্তু গুলোর সম্মান তিনি বৃদ্ধি করেছেন এবং মানবজাতির জন্য উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব

[৭২] *সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫৯।*
[৭৩] *সূরা আল-আনআম, আয়াত : ২৮।*

ও আবশ্যকতা বুঝিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেছেন : وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

ইয়াসীন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের কসম। সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ০২

এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব যার সামনে কিংবা পেছন কোনো দিক দিয়েই মিথ্যার প্রবেশের সম্ভাবনা নেই।[৭৪]

কুরআনের শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং মানবজাতির জন্য তাঁর অপরিহার্যতা বুঝিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ফজর, যোহর আসর এবং দশ রাত্রিরও কসম করেছেন, অর্থাৎ তিনি সময়ের কসম করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সময়ের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করেছেন ঠিক মানব জীবনে সময়ের অপরিহার্যতা ও সময়ের সঠিক মূল্যায়নের আবশ্যকতা প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রেরও শপথ করেছেন।

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا () وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾

সূর্যের শপথ তার কিরণের, চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।[৭৫]

সূর্য ও চন্দ্র আলাদাভাবে আল্লাহ তা'আলার ২টি বৃহৎ সৃষ্টি এবং তার অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের অকাট্য প্রমাণ। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ পৃথিবীর কোনো শক্তি এ দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।[৭৬]

সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উক্ত বিষয়গুলোকে

১. মর্যাদার আসনে সমুন্নত করেছেন ।

২. সবগুলোর ওপর আল্লাহর একক কর্তৃত্বের প্রমাণ দিয়েছেন।

৩. মানবজাতির জন্য উক্ত বিষয়গুলোর অপরিহার্যতা দেখিয়েছেন।

৪. কাফির ও মুশরিকদের প্রতি বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ; আল্লাহর কসমকৃত বিষয়গুলোর কিঞ্চিত নিয়ন্ত্রণ আনয়ন পূর্বক ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের জানান দাও।

৫. তা না পারলে, আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নাও এবং তাঁর আদর্শ দাসে পরিণত হও।

আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটা শপথের মধ্যে রয়েছে : উপদেশ, সতর্কতা, ধমক, কঠোর বার্তা ও কাফির-মুশরিকদের জন্য সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ। নাস্তিকরা তার আগামাথা কিছু না বুঝে অহেতুক সংশয় সৃষ্টির ব্যার্থ চেষ্টায় লিপ্ত, আর এটা ছাড়া তো তাদের কাছে বিকল্প কিছু নেই। কারণ ২০ হাত গভিরতার কূপ থেকে ২ হাত লম্বা রশি দেয় তো বিশুদ্ধ পানির নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ রহম করুন।

সংশয়- ০৯ :

কুরআনের একাধিক জায়গায় রয়েছে-

﴿اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ যদি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান হন কিংবা সবকিছু করতে সক্ষম হন, তাহলে কি তিনি অন্য একজন স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম?? যদি সক্ষমই হন তাহলে অন্য আরো একজন স্রষ্টা আনয়ন করছেন না কেন??

সমাধান :

আল্লাহ তা'আলার অন্য কোনো স্রষ্টাকে সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা।[৭৭]

তাছাড়া যদি আল্লাহ তা'আলা একজন কিংবা দু'জন নয়, হাজারটা স্রষ্টাও যদি সৃষ্টি করেণ তবুও সবগুলোই তাঁর সৃষ্টিই হবে কেউ স্রষ্টা হবে না। কারন স্রষ্টা কখনই সৃষ্টি হয় না। আবার সৃষ্টি কখনই স্রষ্টা হয় না। চলবে ইনশাআল্লাহ।

[৭৪] *ইবন কাছির-৬/৫৬৩ পৃ.।*

[৭৫] *সূরা আশ-শামস, আয়াত : ১-২।*

[৭৬] *আযওয়াউল বায়ান- ৮/৫৩৫-৫৩৭ পৃ.।*

[৭৭] *সূরা যুমার, আয়াত : ৬২।*

সৎ কাজে দ্রুত ধাবিত হওয়ার গুরুত্ব

শেখ ইয়াছিন বিন আরশাদ[❖]

পিনপতন নীরবতায় মসজিদে জড়ো হয়ে বসেছেন বেশ কয়েকজন সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। সকলের চোখ নিবদ্ধ রহমাতুল্লিল-আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে সকলেই ব্যাকুল। তার প্রতিটি কথাই যে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণে ভরপুর। অবশেষে তিনি বললেন : 'আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। প্রচণ্ড আকুলতা আর বিস্ময় নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম বললেন : তারা কারা, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি উত্তরে বললেন : তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা উত্তপ্ত লৌহ শলাকার চিকিৎসা নেওয়া এবং ঝাড়ফুঁক করা থেকে সর্বদা বিরত থেকেছে এবং তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করেছে। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সাহাবী উক্কাশা বিন মুহসিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমার জন্যে দু'আ করুন, আল্লাহ যাতে আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। তিনি বললেন : তুমি তাদের দলভুক্ত। তখন অপর একজন দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহর নাবী! আপনি আমার জন্যেও দু'আ করুন আল্লাহ যাতে আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার আগে চলে গেছে।

একটু চিন্তা করে দেখুন তো! উক্ত হাদীসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম সাহাবী উক্কাশার জন্য বিনা হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় জনকে বললেন তুমি এ কাজে পেছনে পড়ে গেছ। একবার ভাবুন তো এ দুজন সাহাবীর কাজে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কল্যাণকর বিষয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় পিছিয়ে পড়ায় তিনি কত বড় সুসংবাদ হতে বঞ্চিত হলেন?

পৃথিবীর প্রতিটি কাজে ধীরস্থিরতার কথা বলা হলেও সৎকাজে বলা হয়েছে দ্রুততার কথা। কারণ আমরা জানি না সুযোগ থাকার পরেও যে কাজটি ছেড়ে দিচ্ছি, সেটি পরে করার মতো সময় আমার তাক্বদিরে আছে কিনা। তাই তো রাব্বুল আলামীন বলছেন :

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা এবং এমন জান্নাত পাবার জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের দূরত্বের সমান। সেটি প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ভীরুদের জন্য।[৭৮]

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের রবের ক্ষমা এবং এমন জান্নাত পাবার জন্য; যার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের মধ্যকার প্রশস্ততার মতো। যেটি ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।[৭৯]

উপরোক্ত আয়াত দুটোতে রাব্বুল আলামীনের ক্ষমা এবং সুবিশাল জান্নাত পাবার জন্য আল্লাহ দুটি কাজ করতে বলেছেন :

১. সৎকাজে দ্রুততা অবলম্বন।

২. সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা। তাই মুমিনের উচিৎ ভালো কাজের প্রতিটি সুযোগের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা।

সৎকাজে এগিয়ে থাকতে, আমাদের সুযোগসন্ধানী হওয়া চাই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও আমাদের এটিই শিখিয়েছেন। নিচের হাদিসটিতে লক্ষ্য করুন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন :

❖ *দাওরায়ে হাদিস: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।*
অধ্যয়নরত: উম্মুল-কুরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা, সৌদি আরব।

[৭৮] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৩।*
[৭৯] *সূরা আল-হাদিদ, আয়াত : ২১।*

عن ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رَسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لرجلٍ وهو يَعِظه: (اغتنمْ خمسًا قبلَ خمس: شبابَك قبلَ هرَمِك، وصِحَّتَك قبل سَقمِك، وغِناك قبلَ فَقْرِك، وفراغَك قبلَ شُغلِك، وحياتَك قبلَ موتِك)؛ أخرجه الحاكم.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন : পাঁচটি অবস্থা আসার আগেই পাঁচটি সুযোগকে যথাযথ মূল্যায়ন করো।

১. বৃদ্ধ হবার পূর্বে যৌবন কালকে।

২. অসুস্থ হবার আগেই সুস্থতাকে।

৩. দারিদ্র্য চলে আসার আগে ধনাঢ্যতাকে।

৪. ব্যস্ততা চলে আসার আগে অবসর সময়কে।

৫. এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।[৮০]

দ্বীনের প্রতিটি কাজেই আমাদের সুযোগের সৎ-ব্যবহারকারী হওয়া উচিত। এমন অনেক সৎ কাজ রয়েছে যেগুলো চাইলে-ই করা যায় না বরং সুযোগ মতো করতে হয়। যেমন; অসুস্থের খোঁজ নেওয়া, নিজ দায়িত্বে থাকা কাজগুলো যথাসময়ে শেষ করা, বিভিন্ন দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা ইত্যাদি। কিছু তো এমনও আছে যে, একবার সুযোগ হারালে শত আফসোসেও কাজ হয় না। যেমন; সন্তানদের সঠিক শিক্ষায় মানুষ করা।

সাহাবাগণ এ ব্যাপারে সর্বদা-ই সতর্ক ছিলেন এবং তারা এ কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। তাবুক যুদ্ধের কথা মনে আছে তো! রাসূল ﷺ যুদ্ধের তহবিল সংগ্রহ করছেন। সকলেই আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করছেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর এগিয়ে যাবার এই মোক্ষম সুযোগ। তাই তিনি তার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি বাড়িতে কী রেখে এসেছো? তিনি বললেন : অনুরূপ (অর্ধেক) সম্পদ রেখে এসেছি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কেন পিছিয়ে থাকবেন? তিনি তার সাধ্যের সবটুকু সম্পদ দিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী রেখে এসেছো? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে রেখে এসেছি।[৮১] এমনটিই ছিল তাদের প্রতিযোগিতা।

পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়ে আমাদের যত মতানৈক্যই থাকুক না কেন, মৃত্যুর সত্যতা আমরা সকলেই অকপটে বিশ্বাস করি। আর এটাও জানি। যখন কারো মৃত্যু চলে আসে, মুহূর্ত কালের জন্যেও তাকে অবকাশ দেয়া হয় না। তাই আমাদের উচিৎ সৎকাজের প্রতিটি সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগানো। সময়ের মূল্যায়ন করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের নিজের জীবনকে সাজিয়ে তোলা। যাতে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠলে আফসোস করে বলতে না হয়;

'হে আমার রব্ব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদাকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম'।[৮২]

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহিক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা :
ফাতাওয়া বিভাগ
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।
ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

[৮০] *মুসতাদরাকুল হাকেম, হা : ৭৮৪৬।*

[৮১] *আবু দাউদ, হা : ১৬৭৮।*

[৮২] *সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ১০।*

বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য মক্কার পার্লামেন্টে যে লোমহর্ষক সিদ্ধান্ত পাস হয়েছিল

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

(১ম পর্ব)

আমরা যদি নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম বলে দাবি করি তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্যও দিতে হবে যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের নবী ও রাসূল। অন্যথায় আমরা নিজেদেরকে কখনই মুসলিম বলে দাবি করতে পারবো না। সাথে সাথে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম বান্দা, তাঁর সবচেয়ে সম্মানীত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা; তিনি নিষ্পাপ এবং সকল কলুষতা থেকে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আম্বিয়ায় ১০৭ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

অর্থ, আমি তো তোমাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য রহমত রূপে।

অনুরূপভাবে সূরা আহযাব-এর ৪৫-৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

অর্থাৎ, হে নবী, আমি তোমাকেই প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

অন্যদিকে সহীহ মুসলিম-৪/১৭৮২ নং হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হবো আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুঁড়ে আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব, আমিই প্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! রাসূল ﷺ-এর মর্যাদার বিষয়ে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেগুলি লিখলে লেখার কলেবর অনেক বৃদ্ধি হবে বিধায় লেখা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবে আমরা যারা মুমিন মুসলিম বলে দাবি করি তাদের সকলকেই রাসূল ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়া ঈমানের অংশ ও মৌলিক বিষয় বলে মেনে নিতে হবে এবং সত্য কথা তাঁরা মেনেও নেয়।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, পৃথিবীর সকল মুসলিম ও মু'মিনগণ নির্দ্বিধায় বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশেষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নবুয়তপ্রাপ্ত নবী হিসেবে মৌখিকভাবে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা মানতে পারেনি। তারা অবশ্যই রাসূল ﷺ সম্পর্কে ভালই জানতো, কিন্তু ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব লাভের জন্য হিংসায় ঈর্ষায় মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে স্বীকার করতো না এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবর্ণনীয় মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করেছে যেটি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়।

মক্কার মুশরিকদের রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈর্ষার এক পর্যায়ে তারা যখন দেখলো সাহাবায়ে কেরাম পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে তখন তাদের মধ্যে হিংসা এবং ঈর্ষার আগুন আরো দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করলো। কারণ হিসেবে তারা মনে করলো, পূর্ব পুরুষদের ধর্ম মূর্তি পূজা এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে। কারণ তারা ভাল করেই জানতো হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে নেতৃত্ব ও পথ-নির্দেশের যোগ্যতার সাথে সাথে কী পরিমাণ প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার যে প্রেরণা রয়েছে সেটাও মুশরিকদের অজানা ছিল না।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা মনে করলো ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যে বাণিজ্য পথ চলে গেছে মদীনার সে পথের কত ভূমিকা রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর প্রভাবে সেটিও বন্ধ হয়ে যাবে। এ সকল

★ সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া।
সাতক্ষীরা ও খতীব, মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

কারণে তারা দেখলো যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই।

এহেন অবস্থায় তারা কিভাবে এটি বাস্তবায়িত করবে এ লক্ষ্যে দ্বিতীয় বায়আতে আকাবার প্রায় আড়াই মাস পরে নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ২ সফর, মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের বৃহস্পতিবার[৮৩] দিনের প্রথম প্রহরে মক্কার পার্লামেন্ট দারুন-নাদওয়ায় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অধিবেশন আহ্বান করে। এ অধিবেশনে কুরাইশদের সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিলো এমন একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাতে অতিসত্তর ইসলামী দাওয়াতের নিশানা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে ইসলামের আলো চিরতরে নিভিয়ে দেওয়া যায়।

পার্লামেন্টে কুরাইশের যেসব গোত্রের প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়েছিলেন, তাদের পরিচয় :

ব্যক্তির নাম	গোত্র
১. আবু জাহল ইবনে হেশাম	বনী মাখযুম
২. যোবায়র ইবনে মোতায়েম, তুয়ায়মা ইবনে আদী এবং হারেস ইবনে আমের।	বনী নওফাল ইবনে আবদে মানাফ।
৩. শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব	বনী আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ।
৪. নযর ইবনে হারেস	বনী আবদুদ দার
৫. আবুল বাখতারী ইবনে হেশাম, যামআ ইবনে আসওয়াদ এবং হাকিম ইবনে হেযাম	বনী আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা।
৬. নোবায়হ ইবনে হাজ্জাজ এবং মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ।	বনী ছাহাম
৭. উমাইয়া ইবনে খালাফ	বনী জুমাহ[৮৪]

নির্ধারিত সময়ে এবং দিনে প্রতিনিধিরা মক্কার ঐ পার্লামেন্টে পৌঁছে যায়। এ সময় ইবলিস শয়তান এক বৃদ্ধের আকৃতিতে আবায়াহ (আরবীয় পোশাক) গায়ে জড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে সম্মেলন কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন : আমি নজদের অধিবাসী এক বৃদ্ধ। আপনাদের আজকের কর্মসূচির কথা শুনে হাযির হয়েছি। হযরত আমিও কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারবো। তখন সকলেই তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার জন্য যে সকল প্রস্তাব উথাপিত হয়েছিল : অনুষ্ঠানে সকলেই উপস্থিত হওয়ার পরে আলোচনা শুরু হয়। একের পর এক প্রস্তাবও পেশ হতে থাকে।

প্রথম প্রস্তাবে আবু আসওয়াদ বললেন, মুহাম্মদকে আমরা আমাদের মধ্য হতে বের করে দেবো। কোনো প্রকারে মক্কায় থাকতে দেবো না। কোথায় যায় এবং কোথায় থাকে সে খবরও আমরা কেউ রাখবো না। এতেই আমাদের সকল ব্যাপারে ঠিক হয়ে যাবে এবং আমাদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ প্রস্তাব শুনে ঐ বৃদ্ধরূপী শয়তান বললো, এটা কোনো বুদ্ধিসম্মত প্রস্তাব নয়। তোমরা কি জান না তার প্রভাব কত উত্তম, কতো মিষ্টি মধুর যে, কিভাবে সে মানুষের জন জয় করে নেয়। এ প্রস্তাব যদি তোমরা পাস করো

---

[83] *১. দিন তারিখ আল্লামা মনসুরপুরী উদ্ধৃত তথ্যের আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে।*[৮৩]
প্রথম প্রহরে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা বলা হয়েছে, জিবরাঈল আলায়হিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মেলনের খবর এবং হিজরতের অনুমোদনের খবর নিয়ে আসেন।
২. সহীহ বুখারীতে আয়েশা রযিয়াল্লা-হু আন্হা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে হযরত আবু বকর রযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে গিয়ে বলেন হিজরতের অনুমতির কথা।

[৮৪] *আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ১৮৩।*

তবে সে কোনো আরব গোত্রে গিয়ে হাজির হলে তাদেরকে দ্রুত নিজের অনুসারী বানিয়ে তোমাদের ওপর হামলা করবে। তোমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে আরো খারাপ অবস্থায় সৃষ্টি হবে। কাজেই তোমরা অন্য কোনো প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করো।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আবুল বাখতারী বললো, তাকে এক কাজ করা যাক, লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যে পরিণতি কবি (যাহায়র এবং নাবেগা প্রমুখের হয়েছিলো।

নজদী ঐ বৃদ্ধরূপ ধারণ করা শয়তান এবার বললো, এ প্রস্তাবও সমীচীন নয়। আল্লাহর কসম তোমরা যদি এভাবে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখো তাহলে যেভাবেই হোক এ খবর তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যাবে। এরপর তারা যেভাবেই হোক তোমাদের কাছ থেকে হামলা করে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের সম্মিলিতভাবেই আক্রমণ করে পরাজিত করবে। কাজেই অন্য চিন্তা করো।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী দারুন! নাদওয়ার ঐ পার্লামেন্টে পরপর দুইটি প্রস্তাব পাস না হওয়ায় তৃতীয় পর্যায়ে আর একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। এবার এ প্রস্তাবের সাথে পার্লামেন্টের সকল সদস্য ঐকমত্য প্রকাশ করে। এ প্রস্তাবের উত্থাপক মক্কার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী আবু জাহল। সে বললো তার সম্পর্কে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করছি। আমি দীর্ঘক্ষণ অনুধাবন করে দেখছি আমার সে প্রস্তাবের ধারেকাছেও কেউ এখনও পৌঁছাতে পারেনি। সবাই তখন বললো, বল বল হে আবুল হাকাম। কী সেই প্রস্তাব? আবু জাহাল বললো, আমার প্রস্তাব হচ্ছে প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে শক্তিশালী অভিজাত বংশের যুবককে বাছাই করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধারালো তলোয়ার তুলে দেবো। এরপর তারা সবাই গিয়ে একযোগে তলোয়ারের আঘাতে তাকে হত্যা করবে। তারা এমনভাবে হামলা করবে যেন একজনই আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এ লোকটির হাত থেকে রেহাই পাবো। এভাবে হত্যা করায় ফল হবে এ হত্যার দায়িত্ব সকল গোত্রের ওপর পড়বে। বনু আবদে মানাফ সকল গোত্রের সাথে তো যুদ্ধ করতে পারবে না। ফলে তারা রক্তপণ গ্রহণে রাজি হবে আর আমরা তা দিয়ে দেব।[৮৫]

এবার ঐ বৃদ্ধরুপি শয়তান বললো, প্রস্তাব এটাই যথাযথ উপযুক্ত যা এ যুবক বলেছে। তিনি আরো বলেন, যদি কোনো একটি প্রস্তাব পাস হতে পারে তবে তা এই প্রস্তাবই উপযুক্ত। এরপর মক্কার পার্লামেন্ট এ প্রস্তাবে ঐক্যমত্যে উপনীত হয়। সবাই এ সংকল্প নিয়ে ঘরে ফিরলো যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে। *(চলবেন .....)*

গুরুত্বপূর্ণ দু'আ সমূহ

❖ মা-বাবার জন্য দু'আ:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।'

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! কিয়ামত দিবসে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।' *(সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)*

অথবা ﴿رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।'

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।' *(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)*

❖ সুসন্তান লাভের দু'আ :

﴿رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ﴾

উচ্চারণ : 'রাব্বি হাবলি মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাহ, ইন্নাকা সামিউদ দুআ'

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পূতপবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী।' *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩৮)*

[৮৫] *ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮০-৪৮২।*

সৃষ্টি জীবের প্রতি ইহসান : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোহাম্মাদ মিযানুর রহমান*

(পূর্ব প্রকাশের পর থেকে)

দ্বিতীয় প্রকার : إحسان العبد على العبد الآخر-বান্দার প্রতি বান্দার ইহসান।

এ প্রকারের ইহসান দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল একজন ব্যক্তির আচার-আচরণ, শিষ্টাচার ও বদান্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে বিষয়টির সঙ্গে জড়িত আছে এক ভাই অপর ভাই-এর প্রতি, পরিবারের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ আচরণ, সামাজের প্রতি সদাচরণ ও উন্নত মানসিকতার বহিপ্রকাশ। এ পর্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান : সমাজবদ্ধভাবে যাদের পাশে আমরা থাকি, চাই তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এমনকি অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনুসারী যেমন ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অন্য কোনো জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে সকল মানুষ আমাদের পাশে বসবাস করে তারা হ'ল আমাদের প্রতিবেশী। তাদের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে কথা বার্তা, লেনদেন থেকে শুরু করে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িয়ে আছে। নিকটাত্মীয়রা দূরে থাকলেও প্রতিবেশীরা সার্বক্ষণিক আমাদের পাশেই থাকে। তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং জান-মালের নিরাপত্তা থাকে।

প্রতিবেশীর পরিধি : প্রতিবেশীর পরিধি প্রসঙ্গে বিদ্বানগণের নিকট থেকে বেশ কিছু মত পাওয়া যায়। নিম্নে এর কিছু মতামত তুলে ধরা হ'ল।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : **من سمع النداء فهو جار** 'যে আযান শুনতে পায়, সে হ'ল প্রতিবেশী'[৮৬] আবার বলা হয় **من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار** 'যে তোমার সাথে মসজিদে ফজরের সলাত আদায় করবে সে প্রতিবেশী'[৮৭]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: **حد الجوار أربعون داراً من كل جانب** 'প্রতিবেশীর সীমা হ'ল চতুর্দিকে চল্লিশটি ঘর'।[৮৮]

ওয়াহাব প্রতিবেশীর সীমার পরিধি পেশ করতে ইবনু শিহাবের বর্ণনা তুলে ধরে বলেন :

أربعون داراً عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه.

'চল্লিশটি ঘর হ'ল কারো ঘর হ'তে ডানে-বামে, সামনে-পেছনে চল্লিশটি করে ঘর'।[৮৯]

তবে বিদ্বানগণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসটিকে প্রতিবেশীর সীমার পরিধির ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করে বলেন :

'চল্লিশটি ঘর প্রতিবেশীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রতিবেশীকে হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর ঘর হ'তে দূরতম কোন ঘরটি হকদার, তা জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উক্ত কথা বলেন। বিদ্বানগণ আরো বলেন: 'যে ব্যক্তি কোনো মহল্লায় বা শহরে বসবাস করে সে অন্য যে কারো প্রতিবেশী'।

* রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

[৮৬] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী। প্রকাশনায়: দারুল মারেফাহ, বইরুত-১৩৭৯ হিঃ, কিতাবের নম্বর, অধ্যায় ও হাদীস সংযুক্তকারী: মোহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। হাদীসের তাহক্বীক ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপক: মুহিবুদ্দীন আল-খতীব, টীকা সংযুক্তকারী: আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বা (রহি.)। পৃঃ ১০/৪৪৭

[৮৭] ফাতহুল বারী পৃঃ ঐ, ও মোহাম্মাদ বিন ইসমাইল, সুবুলুস্সালাম, প্রকাশনায়: দারুল হাদীস মুদ্রণ এবং তারিখ অনুল্লেখিতভাবে প্রকাশিত- পৃঃ ২/৬৩৪

[৮৮] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী। প্রকাশনায়: দারুল মারেফাহ, বইরুত-১৩৭৯ হিঃ, কিতাবের নম্বর, অধ্যায় ও হাদীস সংযুক্তকারী: মোহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। হাদীসের তাহক্বীক ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপক: মুহিবুদ্দীন আল-খতীব, টীকা সংযুক্তকারী: আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায। পৃ. ১০/৪৪৭।

[৮৯] আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ বিন মোহাম্মাদ আব্দুস্সালাম, মির'আতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতুল মাছাবীহ। প্রকাশনায়: ইদারাতুল বুহুস আল ইলমিয়্যাতু ওয়াদ্দাওয়াতু অলইফতাহ, আল-জামেয়াতুস্সালাফিয়্যাহ, বেনারশ। ২য় সংস্করণ: ১৪০৪ হিঃ ১৯৮৪খৃঃ, পৃঃ ৬/৩৭৩।

এর দলীল হ'ল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾

অর্থ : যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দিব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়ই থাকবে।[৯০]

ইমাম কুরতুবী : (মৃত্যু ৬৭১ হিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

ودل على أن من كان معك ساكنا بالمدينة فهو جار.

'এটা প্রমাণিত যে, শহরে বসবাসকারী যে কোনো বাসিন্দা প্রতিবেশী'।[৯১]

প্রতিবেশীর প্রকারভেদ : সদাচরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবেশী সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

(১) নিকটাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এ প্রতিবেশী দরিদ্র হ'লে তার প্রতি আমাদের তিনটি হক রয়েছে।

তা হ'ল এক. দরিদ্র আত্মীয়তার হক, দুই. মুসলিম হিসাবে তার প্রতি সদাচরণের হক, তিন. প্রতিবেশীর হক।

(২) মুসলিম প্রতিবেশী। এ প্রতিবেশীর প্রতি আমাদেন দু'টি হক রয়েছে, এক. মুসলিম হিসাবে তার প্রতি সদাচরণের হক, দুই. প্রতিবেশীর হক।

(৩) অমুসলিম প্রতিবেশী। তার প্রতি আমাদের একটি হক, আর তা হ'ল সে আমাদের প্রতিবেশী। সে যে ধর্মেরই হোক না কেন; যে কোনো শ্রেণী-পেশার, যে কোনো স্তরের অমুসলিম প্রতিবেশী আমাদের সমাজে থাকলে অন্যান্য মুসলিম প্রতিবেশীর দায়িত্ব হ'ল তার প্রতি সদাচরণ করা। কোনো অবস্থাতেই অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি বর্ণ-বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। আর এটাই হ'ল ইসলাম ধর্মের সুমহান আদর্শ।

প্রবিবেশীর প্রতি ইহসান বা সদাচরণের গুরুত্ব : দ্বীন ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি ইহসানের অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কেননা এর মাধ্যমে যেমন মর্যাদাপূর্ণ নেকী হাসিল করা যায়, অনুরূপভাবে প্রতিবেশীর সাথে আচরণের দ্বারা কোনো ব্যক্তির 'জান্নাত বা জাহান্নাম'-এর চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ধারিত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ইহসানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক কর না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়র সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।[৯২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন :

ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه.

'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হয় যে, শিগগিরই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন'।[৯৩] নিম্নে প্রতিবেশীর প্রতি ইহসানের কতিপয় গুরুত্ব তুলে ধরা হ'ল :

---

[৯০] *সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৬০।*

[৯১] *তাফসীরুল-কুরতুবী, তাহক্বীক : আহমাদ আলবারদুনী ও ইব্রাহীম আতফিশ। প্রকাশনায়: দারুল কুতুব, আল-মিছরিয়্যা, কায়রো। ২য় সংস্করণ : ১৩৮৪ হিঃ - ১৯৬৪ খৃঃ, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪/২৪৭।*

[৯২] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬।*

[৯৩] *সহীহ বুখারী, হা : ৬০১৫, মুসলিম, হা : ১৪১, আবু দাউদ, হা : ৫১৫২, তিরমিযী, হা : ১৯৪২।*

১. প্রতিবেশীর প্রতি ইহসানের গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত : ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা কাফেরদের অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী দেশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর মুসলমানদের মুখপাত্র সেরা বাগ্মী জাফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাসীর দরবারে বলেন : 'হে বাদশা! আমরা জাহেলী যুগে মুর্তিপূজায় লিপ্ত মূর্খ জাতি ছিলাম। আমরা মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম, অশ্লীল কর্ম করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম, আমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করত। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আসলে তিনি আমাদের নির্দেশ দেন,

وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار.

'সত্য কথা বলা, আমানত আদায় করা, নিকত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার'।[৯৪]

২. ইহসানের গুণাবলী অর্জন করা 'ঈমানদার ব্যক্তি' হওয়ার আলামত :

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره

'যে আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়'।[৯৫]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো বলেন :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت ـ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে'।[৯৬]

৩. 'ইহসান' বা সদাচরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করা যায় :

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم.

'তোমরা যদি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে ভালোবাসবেন তাহলে তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে, তা প্রদান কর। কথা বললে, সত্য বল। তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ কর'।[৯৭]

৪. ইহসানের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে বয়স ও গৃহে বরকত বৃদ্ধি করে :

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمّرن الدّيار ويزدن في الأعمار.

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হ'তে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখা ঘরসমূহকে বরকতপূর্ণ করে এবং বয়স (সৎ কর্ম করার তৌফিক) বৃদ্ধি করে।[৯৮]

অর্থাৎ ঘরে ও উপার্জনে বরকত নেমে আসে এবং জীবনে পূর্ণময় আমল করার তৌফিক লাভ করা যায়

[৯৪] *সীরাতু ইবনু হিশাম, তাহক্বীক : মোস্তফা সিকা, ইব্রাহিম আরইয়ার এবং আব্দুল হাফিজ শালাবী। প্রকাশনায় : শারকাতু মাকতাবাহ, মিসর। ২য় সংস্করণ : ১৩৭৫ হি : - ১৯০০ খৃ : , পৃ : ১/৩৩৬।*

[৯৫] *সহীহ বুখারী, হা : ৫১৮৫, সহীহ মুসলিম, হা : ৭৫, আত-তবারানী, হা : ২২৭।*

[৯৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ৪৮, ইবনু মাজাহ, হা : ৩৬৭২, আহমাদ, হা : ২৭১৫৯, তবারানী, হা : ৫০১।*

[৯৭] *ত্বুবারাণী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা : ৪১৮০, আল-মো'জামুল আওসাত, হা : ৬৫১৭।*

[৯৮] *আহমাদ, হা : ২৫২৫৯, বাইহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, হা : ৭৯৬৯, সহীহুল জামে, হা : ৩৭৬৭।*

যা, অনেকে দীর্ঘ হায়াত লাভের পরেও সৎ আমল করার সৌভাগ্য তক্বদীরে জোটে না। হাদীসটি পালনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয় না, যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করার পরেও অভাব-অনটনে ভুগতে থাকে।

৫. ইহসান বা সদাচরণ জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম :

আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كن محسنا قال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: " سل جيرانك، فإن قالوا: إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا: إنك مسيء فأنت مسيء هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এন নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), 'আপনি আমাকে এমন একটি কর্মের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব'। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: 'তুমি সদাচরণকারী হও'। লোকটি বলল, 'কিভাবে বুঝবো যে, আমি সদাচরণকারী'। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস কর, অতঃপর তারা যদি বলে : 'তুমি সদাচরণকারী তবে তুমি সদাচরণকারী হিসাবে গণ্য হবে' আর যদি তারা বলে : 'তুমি মন্দ লোক তবে তুমি মন্দ'।[৯৯]

৬. অসদাচরণকারী দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عيه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ দেওয়া হয়েছে। আর যাকে সেই কোমলতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে উক্ত ইহকাল ও পরকালের বিরাট কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[১০০]

সদাচরণ, বিনয় ও নম্রতা এমন এক মানবীয় গুণ যা, এর প্রভাব সহজেই মানুষের হৃদয়ে পড়ে এবং অন্তরে শ্রদ্ধাপূর্ণ জায়গা করে নেয়। মানুষ মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু আচরণ জীবন্ত থাকে। ফেলে আসা বিগত ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবদি সমাজের উদার ব্যক্তিত্বের লোকগুলিকে মানুষ আজও স্মরণ করে। পক্ষান্তরে ইতিহাস সেরা জালেম ও সমাজের হীনব্যক্তিত্বের দূরাচার লোকগুলোকে মানুষ ঘৃণাভরে স্মরণ করে। আর এ লোকগুলোই হ'ল আল্লাহ তা'আলার নিকট অসার প্রাণী মাত্র। সমাজের এ সমস্ত লোকেরা সেদিন কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে সমস্ত কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কঠোরতা ও অকল্যাণ হ'তে দূরে রাখুন এবং ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করুন! *চলবে ইনশাআল্লাহ*

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/
ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

[৯৯] *মুসতাদরাক আল- হাকিম, কিতাবুল জানাইয অধ্যায়, হা : ১৩।*

[১০০] *শরহু সুন্নাহ, মিশকাত হা : ৫০৭৬।*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

সালাফী মানহাজ অনুসরণের আবশ্যকতা ও বিদ'আতীদের প্রতি শিথিলতা এবং কঠোরতা অবলম্বনের মূলনীতি

ভাবানুবাদ ও সংকলনে : মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম ❁

(পূর্ব ১ম পর্ব প্রকাশের পর থেকে-২য় পর্ব)

সালাফদের বুঝে শরীয়ত বোঝার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো - বিভিন্ন ধরনের দলাদলি, মতভেদের কোন্দলে তাঁদের অনুসৃত অনুসরণীয় পদাংক অনুসরণ করা। ফলে যতই মতভেদ কিংবা দলাদলি হোক না কেন সহজেই হকের ওপর সুদৃঢ় থাকা যায় এবং তাঁদের পথের ওপর অবিচল থেকে ঐক্যবদ্ধ জামাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। আমরা দেখেছি ইসলামের ইতিহাসে সালাফদের অবস্থান। যখন ফিতনায় নিমজ্জিত গোটা সমাজ এবং বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় তমসাচ্ছন্ন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখন সালাফগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে ফিতনার এই বিদ্ঘুটে পরিবেশে অনুসরণীয় নীতিমালা দেখিয়েছেন। ফলে দলাদলি মতভেদ যতই হোক না কেন কোরআন সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের অনুসৃত পথ অনুসরণ করলেই হেদায়েতের ওপর অবিচল থাকা সম্ভব হবে এবং সকল ধরনের ফিতনামুক্ত জীবন গঠনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হওয়া যাবে। মূলতঃ ফিতনার সময়ে কোরআন ও সুন্নাহর ওপর অটল থাকার মধ্যেই সবচেয়ে বড় সফলতা ও জীবনের বড় প্রাপ্তি। আর এটাই হলো সালাফদের অনুসরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা। কেননা সালাফদের পথ হলো নূহ আলাইহিস সালাম এর নৌকার মতো, যে এই নৌকাতে আরোহণ করবে সেই কেবলমাত্র পরিত্রাণ পাবে। । শায়েখ বিন ফাওযান আল ফাওযান হাফিঃ বলেন,

من أراد النجاة فعليه مذهب السلف و التمسك به و الدعوة إليه فهو الطريق النجاة هو سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تركها و غرق في الضلال فلا نجاة إلا بمذهب السلف.

"অতএব যে মুক্তি পেতে চায় তার জন্য আবশ্যক সালাফদের মাযহাব জানা এবং তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর দিকে দাওয়াত দেওয়া। সেই পথেই হলো মুক্তি। সেটা হলো নূহ আলাইহিস সালাম-এর নৌকা। যে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে আর যে আরোহণ করবে না সে ধ্বংস হবে এবং ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে।[১০১]

❖ সালাফী মানহাজ অনুসরণের হুকুম :

সালাফী মানহাজ অনুসরণ করা উম্মাহর জন্য ওয়াজিব। কেননা সালাফী মানহাজ অনুসরণ করা মানেই আল্লাহর নির্দেশিত রাসূল ﷺ এর দ্বীনের অনুসরণ করা ।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল আজুরী বলেন, প্রত্যেক বিবেকবান মুমিন চেষ্টা করবে আল্লাহর কিতাব অনুসরণের জন্য এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহসমূহ ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহসমূহ অনুসরণের জন্য এবং তাবে তাবেয়ীগণের সুন্নাহসমূহ অনুসরণের জন্য তাঁরা যা নাকচ করেছেন আমরাও তা নাকচ করবো এবং তাঁরা যা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছে আমরাও তা গ্রহণ করবো এবং তাঁর ব্যাপারে বলবো।[১০২]

কেননা গোটা ইসলাম বলতে সালাফী মানহাজ বোঝায় আর সালাফী মানহাজ বললে ইসলামকেই বোঝায়। শায়েখ সালেহ আল ফাওযান আল ফাওযান হাফিঃ বলেন,

فإن السلفية هي الإسلام و الإسلام هو السلفية.

❁ দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাা দারুস সুন্নাহ মিরপুর ঢাকা।

[১০১] মানহাজুস সালাফ আস সালেহ ওয়া হাজাতুল উম্মাতু ইলাই, পৃষ্ঠা -১১।
[১০২] কিতাব - আরবাঈনা হাদিসান।

নিশ্চয় সালাফীয়াত হলো ইসলাম আর ইসলাম হলো সালাফীয়াত।[১০৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে সালাফী পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য আবশ্যক হলো পথভ্রষ্টতা এবং বৈপরীত্য এবং সে দ্বিগুণ মূর্খতার মধ্যে স্থায়ী থাকবে অথবা নিরেট মূর্খতার মধ্যে।[১০৪]

তিনি আরো বলেন,

لا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل و أكمل .

'কোনো মানুষের জন্য উচিত নয় যে, সে সালাফের পথ পরিত্যাগ করবে। নিশ্চয়ই তা (সালাফদের পথ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ।[১০৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোনো দোষ নেই যে সালাফী মাযহাবকে প্রকাশ করে এবং তাঁর দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে (সালাফী বলে) কেননা সালাফদের মাযহাব হক ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।[১০৬]

আবুল মুযাফফর আস সামআনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আহলুস সুন্নাহর নিদর্শন হলো- সালাফে সালেহীনের অনুসরণ করা।[১০৭] এজন্য শায়েখ সালেহ আল ফাওযান আল ফাওযান হাফিঃ বলেন, সালাফীয়াত হলো- সঠিক মানহাজ, যার ওপর চলা আমাদের ওপর আবশ্যক এবং আমরা পরিত্যাগ করবো যা তাঁর মানহাজের বিপরীত।[১০৮]

এজন্য কবি বলেছেন,

كل خير اتباع من سلف و كل شر فى ابتداء من خلف.

সকল কল্যাণ সালাফদের অনুসরণে নিহিত আর সকল অনিষ্টের উদ্ভাবন খালাফদের (পরবর্তীদের) মধ্য থেকে।

ইমাম আওযায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم يعني السلف .

'তুমি তোমার নফসকে সুন্নাহর ওপর ধৈর্য ধারণ করে রাখো এবং কওম (সালাফগণ) যেভাবে অবস্থান করেছে তেমনভাবে অবস্থান করো।[১০৯] তিনি আরো বলেন, তোমার ওপর আবশ্যক হলো সালাফদের পদাংক অনুসরণ করা যদিও তোমাকে মানুষ পরিত্যাগ করে।[১১০]

❖ **সালাফিয়্যাত মানহাজ নাকি জামাতের নাম :** সালাফিয়্যাত কোনো দল, সংগঠন বা কোনো ফাউন্ডেশনের নাম নয় বরং সালাফিয়্যাত হলো একটি আদর্শিক মানহাজের নাম। এটা এমন একটি মানহাজের নাম যা সালাফদের তথা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের আকীদা, আমল, হুকুম, আহকাম ও তারবিয়াতের ওপর চলমান আদর্শিক মহোত্তম পথ ও পন্থার নাম। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সালাফিয়্যাত মানহাজ নাকি জামাতের নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন,

السلفية منهج و طريقة لا جماعة و تنظيم كما يظنه البعض.

'সালাফিয়্যাত মানহাজ এবং তরীকার নাম, জামাত বা সংগঠনের নাম নয় যেমনটি কতিপয় মানুষ মনে করেন।[১১১]

সালাফিয়্যাতের বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা যখন বলবো আমরা সালাফি তখন এটা দ্বারা আমরা উদ্দেশ্য করি সর্বোত্তম দল যা নবী রাসূলের পর

---

[১০৩] *তানযীহুদ দাওয়াত আস সালাফীয়াহ মিনাল আলকাবিল তানফিরিয়াহ, পৃষ্ঠা- ৮।*

[১০৪] *দারউ তায়ারুযুল আকল ওয়া নকল, ৫/ ৩৫৬।*

[১০৫] *তানযীহুদ দাওয়াত আস সালাফীয়াহ মিনাল আলকাবিল তানফিরিয়াহ, পৃষ্ঠা-৯।*

[১০৬] *ঐ, পৃষ্ঠা- ১০।*

[১০৭] *আল ইনতিছারুল আসহাবিল হাদীস, পৃষ্ঠা- ৩১।*

[১০৮] *তানযীহুদ দাওয়াত আস সালাফীয়াহ মিনাল আলকাবিল তানফিরিয়াহ, পৃষ্ঠা-, ৯।*

[১০৯] *জুহুদুল আওযাঈ, পৃষ্ঠা- ১২৮।*

[১১০] *ঐ, পৃষ্ঠা -১৩৩।*

[১১১] *মানহাজুস সালাফী ইনদাশ শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী পৃষ্ঠা -১৩।*

জমিনের ওপর পাওয়া গেছে। আর তারা হলেন সাহাবী যারা ছিল প্রথম শতাব্দীর। অতঃপর পরবর্তীতে দ্বিতীয় শতাব্দীতে আসে তাবেঈনগণ। অতঃপর তৃতীয় শতাব্দীতে আসে তাবে তাবেয়ীগণ। তিনি বলেন, যখন আমরা সালাফদের দিকে নিসবত করব এর অর্থ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর দিকে নিসবত করি। আবশ্যক হলো এটার দিকে (সালাফিয়্যাত) নিসবত করা কেননা এটার নিসবত কোনো ব্যক্তির কিংবা কোনো জামাতের দিকে নয়।[১১২]

❖ সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি :

ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সালাফী মানহাজের দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছয়টি বিষয় পেশ করেছেন। সেই ছয়টিকে তিনি সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেগুলো হলো -

১. কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে অনুসরণ করা :

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের নিকট উসুলুস সুন্নাহ হলো নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যার ওপর ছিলেন তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরা এবং অনুসরণ করা।

আর এই অনুসরণ, আনুগত্য কোন পদ্ধতিতে হবে সেটাও তিনি বলেছেন, কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে। আর সেই পদ্ধতি হলো- **على فهم السلف الصالح** 'সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী।

২. বিদ'আত বিসর্জন করা

৩. তাওহীদ

৪. উপকারী ইলম অর্জন করা

৫. পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ।[১১৩]

❖ সাহাবী ও সালাফে সালেহীনদের গালি দেয়া এবং তাঁদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য পোষণ করা নিষিদ্ধ :

রাসূল ﷺ এর সকল সাহাবী সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। উম্মাহর কর্ণধার। ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন তাঁরা। তাঁদের অবদান ইসলামের ইতিহাসে অসামান্য। এজন্য রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

'তোমরা আমার (প্রথম যুগের) কোনো সাহাবাকে গালি দিও না। কারণ, তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না"।[১১৪]

অন্য হাদিসে এসেছে,

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْـمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

'যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবাকে গালি দিলো তার ওপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হোক'।[১১৫]

এ ছাড়াও একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলের সাহাবীগণকে গালি দেয়া কুফুরী কাজ।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমাদেরকে রাসূলের সাহাবীগণের জন্য ইস্তেগফার করার আদেশ করা হয়েছে অথচ তোমরা তাঁদের গালি দিচ্ছো।[১১৬]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের গালি দিও না, কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাঁদের জন্য ইস্তেগফার করার জন্য আদেশ করেছেন।[১১৭]

যেহেতু সালাফদের অবদানে আমরা চির ঋণী এবং তাদের অসামান্য অবদানের কারণেই আমাদের বিশুদ্ধ মানহাজ ও কোরআন, সুন্নাহর বিশুদ্ধ ব্যখ্যায় জীবন পরিচালিত করার সুযোগ পাওয়া সেটা সত্যিকারার্থে তাঁদের অবদান অতুলনীয় এবং তাঁদের কাছে আমরা

[১১২] *ঐ, পৃষ্ঠা ১৪।*

[১১৩] *মানহাজুস সালাফী ইনদাশ শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী পৃষ্ঠা- ২৩।*

[১১৪] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হা : ২৫৪১।*

[১১৫] *ত্বাবারানী/কবীর ১২৭০৯ সাহীহুল্ জামি', হা : ৫২৮৫।*

[১১৬] *শারহু ওয়াল ইবানা-১২০ পৃষ্ঠা।*

[১১৭] *আছ ছরেমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা-৫৭৪, ও শারহু ওয়াল ইবানা-পৃষ্ঠা-১১৬।*

চির কৃতজ্ঞ। সাহাবী হোক কিংবা তাবেয়ী হোক কিংবা তাবে তাবেয়ী হোক রাসূলের মুখনিঃসৃত ভাষায় যেহেতু বলা হয়েছে তাঁরা সোনালী, সর্বোত্তম যুগের দ্বীনের উজ্জ্বল নক্ষত্র সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের তাঁদের প্রতি সম্মান, তাঁদের হক যথাযথ আদায় করা ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আবু যুরআ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে রাসূলের কোনো সাহাবীকে প্রত্যাখ্যান করতে দেখবে, জেনে রাখো! সে জিন্দিক।[১১৮]

যে কোনো বিদ'আতী ব্যক্তির নিদর্শন হলো সালাফী মানহাজের অনুসারী কিংবা যে বা যারা সহীহ আকীদা ও মানহাজ অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তারা তাঁদের বিভিন্ন নামে নামকরণ করে, গালি দেয়, মন্তব্য করে, বিদ্বেষ পোষণ করে এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রও করে। এজন্য হাফেজ, মুহাদ্দিস আহমাদ বিন সিনান আল কাত্তান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

ليس في الدنيا مبتدع إلا و هو يبغض أهل الحديث .

দুনিয়াতে এমন কোনো বিদআতী নেই যে আহলে হাদিসের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে।[১১৯]

❖ বিদ'আতের বিরুদ্ধে কোরআন সুন্নাহর ফয়সালা :

ইসলামী শরীয়তে বিদ'আত একটি ঘৃণিত পাপ এবং তাঁর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি সংকেত প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা কোরআনের মধ্যে বিদ'আতের মারাত্মক নিন্দা করেছেন এবং সেই সাথে বিদ'আতীদের ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। কেননা ইসলামী শরিয়ত পরিপূর্ণ। নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণতা করা হয়েছে। তারপরবর্তী কোনো পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন, সংযোজন কিংবা বিয়োজনের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম[১২০] বিদ'আতীদের স্বভাব চরিত্র হলো কোরআন সুন্নাহর মধ্যে বিভেদ বিভাজন সৃষ্টি করা এবং পারস্পরিক কোন্দল সৃষ্টি করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এমন চরিত্রের নমুনা পেশ করে বলেন -

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا﴾

'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে।[১২১] এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- বিদ'আতপন্থী। ঠিক তার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছেন।

﴿يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ﴾

'সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে।[১২২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারকগণ বলেছেন, বিদ'আতীদের মুখ কালো কুৎসিত হবে আর সুন্নাহর অনুসারীদের মুখ উজ্জ্বল হবে। বিদ'আত বিসর্জন করা সুন্নাহর আলোকে ইবাদত সম্পন্ন না করা ব্যতীত যে কারো ইবাদত কবুল হবে না। কারণ বিদ' আত করা মানে ইসলামী শরীয়তকে পরিবর্তন করা । ইসলামী শরীয়তের ওপর হস্তক্ষেপ করা। যেমনটা পূর্ববর্তী জাতি করেছে তাদের শরীয়ত মানার ক্ষেত্রে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের শরীয়তের ওপর টিকে থাকতে পারেনি এবং সেইসাথে তারা তাদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাদের শরীয়তকে নষ্ট করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (٠) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

---

[১১৮] *ঐ, ১/১০।*

[১১৯] *আকিদাতুস সালাফ ওয়া আছহাবিল হাদীস পৃষ্ঠা-৩০০।*

[১২০] *সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৩।*

[১২১] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৫।*

[১২২] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৬।*

صُنْعًا (٠) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

'বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ওরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে, তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কুফরি করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোনো ওজনের ব্যবস্থা রাখব না।[১২৩] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই সেই আমল বর্জনীয়।[১২৪]

❖ বিদ'আত ও বিদ'আতীর বিরুদ্ধে সালাফদের নিন্দা:

১. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান বিন হাদীকে উপদেশ দিতে বলেন,

نعم عليك بتقوى الله و الاستقامة إتبع و لا تبتدع .

হ্যাঁ তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে, ইসলামের বিধি-বিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে, তুমি অনুসরণ করে চলবে বিদ'আত করবে না।[১২৫]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق.

'তোমরা অবশ্যই এলেম শিক্ষা করবে। আর খবরদার! তোমরা কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হবে না। খবরদার! তোমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না। খবরদার তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে (পূর্ববর্তী) আঁকড়ে ধরে থাকবে।[১২৬]

তিনি আরো বলেন,

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

তোমরা অনুসরণ করো বিদ'আত করো না। কারণ দ্বীনের মধ্যে যা আছে তাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[১২৭]

তিনি বলেন,

الاقتصاد في السنه احسن من الاجتهاد في البدعة.

'বিদআত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নতের ওপর অল্প আমল করা উত্তম।[১২৮]

৩. হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মতো এই দুটি পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো বিদ'আত বর্জন করা হয় তাহলে সবাই বলবে সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (অর্থাৎ বিদ'আতকে সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করবে আর সুন্নাতকে বিদ'আত হিসেবে গ্রহণ করবে যার ফলে এমন পরিস্থিতি হবে)[১২৯]

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة .

সকল বিদ'আত পথভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে ভালো মনে করে।[১৩০]

৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কে এক ব্যক্তি সালাম জানালে তিনি তাবেয়ী নাফে রহিমাহুল্লাহ কে বলেন, আমি শুনেছি, সে নাকি বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছে। যদি সে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমার সালাম জানাইও না।[১৩১]

---

[১২৩] *সূরা কাহফ, আয়াত : ১০৩-১০৫।*
[১২৪] *সহীহ মুসলিম, আয়াত : ৪৫৯০, সহীহ বুখারী, হা : ৭৩৫০।*
[১২৫] *দারেমী, মুকাদ্দামা, হা : ১৩৯।*
[১২৬] *দারেমী মুকাদ্দামা, হা : ১৪২।*
[১২৭] *দারেমী ১/৮০।*
[১২৮] *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব -১/৯৩।*
[১২৯] *ইবনে ওয়াদ্দাহ আল কুরতুবী, আল বিদা ওয়ান নাহইউ পৃষ্ঠা. ৫৮।*
[১৩০] *আলবানী, আহকামুল জানায়িয পৃষ্ঠা ২০০-২০২।*
[১৩১] *ইবনে মাজাহ, হা : ৪০৫১।*

৬. ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তুমি হেদায়েতের পথ অনুসরণ করো। অল্প সংখ্যক পথচারী তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সাবধান! ভ্রষ্টতার পথ অনুসরণ থেকে বিরত থাকো।[১৩২]

৭. হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك .

'তুমি বিদ'আতীর সাথে বসা থেকে বিরত থাকো! কেননা সে তোমার অন্তরকে অসুস্থ (বিদ'আতের প্রতি আকৃষ্ট) করবে।[১৩৩]

৮. ইবনে সীরীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তোমরা তাদের সাথে কথা বলো না নিশ্চয়ই আমি আশংকা করছি তারা তোমাদেরকে ধর্মত্যাগী বানাবে।[১৩৪]

৮. হাসসান বিন আতিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

ما ابتدع قوم في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم يوم القيامة .

যে ব্যক্তি দ্বীনে কোনো বিদ'আত গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর থেকে ততটুকু সুন্নাত উঠিয়ে নেন। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে সে সুন্নাত ফিরিয়ে দেয়া হয় না।[১৩৫]

৯. সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها و البدعة لا يتاب منها .

'শয়তান পাপের পরিবর্তে বিদ'আতকে বেশি পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তো লোকেরা তাওবা করে নেয়, কিন্তু বিদ'আত থেকে তাওবা করে না।[১৩৬]

১০. ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

إذا رأيت مبتدعا فى طريق فخذ فى طريق آخر و لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل و من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين.

'যখন তোমরা বিদ'আতপন্থী কোনো লোককে আসতে দেখবে তখন সে রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা গ্রহণ কর। কারণ বিদ'আতীর কোনো আমল আল্লাহর নিকট কবুলযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি বিদ'আতপন্থীকে সাহায্য করল সে যেন দ্বীন ধ্বংস করতে সাহায্য করল।[১৩৭]

❖ বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টের বই পড়া, কেনাবেচা করা যাবে কিনা? :

বিদআতী ও পথভ্রষ্টের বইয়ের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টের বইসমূহ আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং বিনাশ করতে হবে। আর যে এই কাজ করবে তার কোনো জরিমানা নেই।

মারওয়াযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে পথভ্রষ্টদের বইয়ের বিষয়ে বললাম যে, আমি তা আগুনে পুড়িয়ে দিবো নাকি ছিঁড়ে ফেলবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ (আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারো অথবা ছিঁড়ে ফেলতে পারো)।

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারীর বইয়ের ব্যবসা করা। জায়েজ নেই

বিদআতী ও পথভ্রষ্টের বই পড়া, কেনাবেচা করার ব্যাপারে সালাফগণ খুবই সতর্কতা জারি করেছেন এবং তাদের বইকে উন্মুক্ত সকলের জন্য পড়া, ধরা, অবলোকন করা এবং কেনাবেচা, সংরক্ষণ করার ব্যাপারে মারাত্মক কঠোরতা ও অনুমতি প্রদানে নীতিমালা প্রয়োগ করেন। বিদআতীদের বই শুধুমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন যে, শরীয়তের জ্ঞানে পরিপক্ক এবং সালাফদের মানহাজের ওপর দৃঢ় থেকে তাদের বইসমূহ থেকে ভুল ভ্রান্তি অবলোকন করে জাতিকে সতর্ক করার নিয়তে বিদআতী, পথভ্রষ্টের বইসমূহ পড়ার অনুমতি প্রদান করেছে।[১৩৮] ***চলবে ইনশাআল্লাহ***

---

[১৩২] *আবী আব্দিল্লাহ খলিল বিন আহমদ আল কালারী, ওজুবু ইত্তিবায়ি মানহাজিস সালাফ, পৃষ্ঠা-২৬।*

[১৩৩] *ঐ, পৃষ্ঠা-২৭।*

[১৩৪] *ঐ, পৃষ্ঠা -২৭।*

[১৩৫] *মিশকাত, তাহকীক আলবানী, প্রথম খণ্ড - ১৮৮।*

[১৩৬] *কিতাবুস সুন্নাহ, আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), প্রথম খণ্ড - ১৩।*

[১৩৭] *খাছায়িছু আহলিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা-২২।*

[১৩৮] *কুতুবু হাযযারা মিনহাল ওলামা, পৃষ্ঠা -৩৮-৪৭।*

হারামের রহস্য কী ?

শাহিদুল ইসলাম বিন সুলতান *

{পূর্বের সংখ্যায় প্রকাশের পর থেকে}

সবকিছু হালাল করলে কী ঘটতো : পৃথিবীর সব কিছুই সবার জন্য হালাল হলে প্রত্যেকেরই অধিকার খর্ব হতো। যার দরুণ সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজ করতো। সবাই সর্বদা হতাশায় দিনাতিপাত করতো। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। যেমন- রক্তপাত যদি বৈধ হতো তাহলে হয়তো আজ আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না। খুনাখুনির পৃথিবী কায়েম হতো। এটি যদিও কিছু মানুষের স্বার্থ হাসিল হয় কিন্তু গোটা মানব সমাজের স্বাধীনতা অনিরাপদ হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে যদি চুরি করা বৈধ হতো তাহলে সম্পদের সুরক্ষা সাধিত হতো না। সবাই চায় তার সম্পদ বর্ধিত করতে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾

এবং অবশ্যই মানুষ ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত প্রবল।[১৩৯] আল্লাহ তা'আলা মানুষের মননে সম্পদ বৃদ্ধির তাড়না সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝেও আরো অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে।

সম্পদ বর্ধিত করার বৈধ ও অবৈধ সব উপায়ই যদি বৈধ করা হতো তাহলে বিশ্ব আর সামনে এগোতে পারতো না, এই স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পরপরই লুটের বিশ্ব তৈরি হতো। লুটতরাজের ভয়ে কৃষকরা কৃষি কাজ, খামারীরা পশুপালন, পোশাক শিল্পের লোকেরা পোশাক তৈরি ছেড়ে দিতো। এর কারণে পৃথিবীতে অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদির মারাত্মকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

কিছু হারামের রহস্য :

ইসলামে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তার কিছু আমাদের তৎক্ষণাৎ বুঝে আসতে পারে আবার দেরিতেও বুঝে আসতে পারে। এটি শুধু পরীক্ষা মাত্র যে, আমরা শরীয়তের বিধানাবলীকে নির্দ্বিধায় মেনে নেই কিনা। আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অতঃপর ইসলামের কোনো কাজের বৈজ্ঞানিক রহস্য খুঁজে বের করায় কোনো সমস্যা নেই। এতে আমাদের মন মস্তিষ্ক সেই বিধান পালনে বা বর্জনে আরো মনোযোগী হবে এবং ইসলামের শত্রুদের অভিযোগগুলো খণ্ডন করা যাবে। নিম্নে কিছু হারামের কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

(১) মদ হারামের কারণ : মদ ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ এটিতে নেশার উদ্রেক হয়। মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক হয়ে যায়। যার কারণে মদপানকারী আবোল-তাবোল বকে, গালি-গালাজ করে। এরই প্রেক্ষিতে অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হয়। স্থায়ী ঝগড়া-বিবাদের উদ্রেক করে।

মদ সকল হারামের পথ খুলে দেয়। মদ সকল অপরাধের মূল উৎস। এটির মাধ্যমে অন্যান্য পাপকাজ সহজ হয়ে যায়।

(২) বেগানা মহিলাকে দর্শন ও নির্জনে গমন : পরপুরুষ ও পরনারীকে দেখা ও নির্জনে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ এবং হারাম করা হয়েছে। কারণ এটি ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় এমন সকল মাধ্যমকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১৪০]

(৩) চির কুমার থাকা : ইসলামী শরীয়তের প্রধান পাঁচটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা- (ক) দ্বীন রক্ষা (খ) আত্মরক্ষা (গ) জ্ঞান রক্ষা (ঘ) বংশ রক্ষা (ঙ) সম্পদ রক্ষা।

মানুষের প্রবৃদ্ধির জন্য ও বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে আল্লাহ তা'আলা বিবাহ বন্ধনের বিধান জারি

* দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৩৯] সূরা আদিয়াত, আয়াত : ০৮।

[১৪০] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩২

রেখেছেন। সাধারণভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। ব্যক্তিভেদে বিবাহের বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

বিবাহ থেকে বিরত থেকে আজীবন কুমার থাকা হারাম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ."

আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মুতাবিক কাজ করলো না সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করবো। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে এবং যার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম রাখে। কারণ সাওম তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।[১৪১]

(৪) পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা : ইসলামে নারীদের জন্য স্বর্ণ পরা হালাল হলেও পুরুষদের জন্য হারাম। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে কাকতালীয় ও রহস্যজনক মনে হয়। একই জিনিস পুরুষদের জন্য হারাম আবার নারীদের জন্য হালাল।

মানুষের সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণ হচ্ছে সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু। বস্তুটি সৌন্দর্য ও গয়না হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। আর পুরুষের এটা দরকার নেই। অর্থাৎ পুরুষ এমন মানুষ নয় যে, তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে পরিপূর্ণ হতে হবে। বরং তার পৌরুষত্বের কারণে সে নিজেই পরিপূর্ণ মানুষ। তাছাড়া নিজের দিকে অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষের সৌন্দর্য অবলম্বন করারও দরকার নেই। কিন্তু নারী এর বিপরীত। নারী অপূর্ণ, তার সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা দরকার। এ কারণে সর্বোচ্চ মূল্যে গয়না দিয়ে তাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার প্রয়োজন দেখা যায়। যাতে করে তার ঐ সৌন্দর্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করে, স্বামীর কাছে স্ত্রী হয়ে ওঠে আবেগময়ী ও আকর্ষণীয়। আর এ কারণেই নারীর জন্য স্বর্ণ দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা বৈধ করা হয়েছে, পুরুষের জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা নারী প্রকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে এরশাদ করেন,

﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾

'যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?' (তাকে কি তোমরা আল্লাহর সন্তান হিসেবে সাব্যস্ত করবে?)[১৪২] আর এভাবেই শরীয়তে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার রহস্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।[১৪৩]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, স্বর্ণ পুরুষদের স্পার্মের চলন ক্ষমতা (Motility) বহুগুণ কমিয়ে দেয়। পুরুষদের বন্ধ্যাত্বের অন্যতম একটি কারণ স্পার্মের চলন ক্ষমতা কমে যাওয়া। এছাড়া স্বর্ণের প্রভাবে স্পার্মের ডিএনএর (DNA) ক্ষতিকারক পরিবর্তন (Mutation) হয়। সন্তান প্রতিবন্ধী হবার অন্যতম কারণ স্পার্মের এই জ্বিনগত ক্ষতিকর পরিবর্তন।

(৫) স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করা : স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানাহার করা মুসলিম নর-নারী উভয়ের জন্যই হারাম। অতি বিলাসিতায় নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া থেকে পবিত্র করার জন্য এটিকে হারাম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপচয় ও গর্ব-অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। বিশেষত অসহায় ব্যক্তিদের অন্তর ভেঙে যায়।

হীরা, মণিমুক্তার পাত্রে নিষেধ করা হয়নি যা স্বর্ণ-রূপার চাইতে বেশি মূল্যবান। কারণ অসহায় ব্যক্তিরা হীরা, মণিমুক্তা সম্পর্কে অতটা ওয়াকিফহাল নন যার ফলে তাদের অন্তরে দুঃখ পাবে।

আর যারা এ ধরনের নিষিদ্ধ পাত্রে পানাহার করবে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

[১৪১] *সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৮৪৬*

[১৪২] *সূরা যুখরুফ, আয়াত : ১৮*

[১৪৩] *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ ."

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত বাসনে পান করে সে শুধু তার পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।[১৪৪]

(৬) জুয়া : সম্পদ রক্ষা করা ইসলামী শরীয়তের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্যতম। সম্পদ রক্ষা করতে ইসলাম যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে। এমনকি নিজ সম্পদ রক্ষার লড়াইয়ে কেউ মারা গেলে তাকে শহীদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

অপরপক্ষে সম্পদ নষ্ট করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সম্পদ বিনষ্টের যত মাধ্যম রয়েছে সবগুলোকে হারাম করা হয়েছে। অপচয়, অপব্যয়, মদ, জুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট হয়।

কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনার আলোকে জুয়া, অপচয়, অপব্যয় ইত্যাদিকে হারাম ঘোষিত হয়েছে। এর কারণে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সালাত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে।

(৭) বনি হাশেমের ওপর যাকাত হারাম হওয়ার কারণ: বনী হাশেম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ বংশের অধিকারী। তাদের সম্মানার্থে যাকাত হারাম করা হয়েছে। যাকাত হলো মানুষের উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর স্ত্রীবর্গ ও বনী হাশেমের ওপর যাকাত গ্রহণ করা হারাম। বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত হলেন- হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবু লাহাব বিন আব্দুল মুত্তালিব ও আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। এঁরাই হলেন বনী হাশেম। আর বনী হাশেমের বাকি লোকেদের বংশধারা অব্যাহত থাকেনি। তাঁদের বংশ পরম্পরা চলমান না থাকায় তাঁরা এখান থেকে বাদ পড়েছেন।

[১৪৪] *সহীহ মুসলিম, হা : ২০৬৫।*

মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে সাধারণ সাদাকাও হারাম ছিল। অন্যান্য বনী হাশেমের সাদাকা গ্রহণ করার ব্যাপারে দুটি মত পরিলক্ষিত হয় :

(১) মুহাম্মাদ ﷺসহ বনী হাশেমের ওপর সাদাকা গ্রহণ করা হারাম ছিল।

(২) শুধু মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর হারাম ছিল। বাকিদের ওপর জায়েজ ছিল।

স্মর্তব্য, সকলের জন্য হাদীয়া গ্রহণ করা জায়েজ আছে।

ইসলামী শরীয়তে কোনো কাজ বা কথা হারাম প্রমাণিত হলে তাকে নির্দ্বিধায় হারাম বলে বিশ্বাস করে পরিত্যাগ করা একান্ত অপরিহার্য। সেটি আল্লাহর কালাম কুরআনের মাধ্যমে হোক অথবা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাণী হাদীসের মাধ্যমে হোক। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলকে তাঁর নিষিদ্ধ সকল কাজ থেকে স্বঅনুগ্রহে বিরত রাখেন। আমিন। ❑❑

ডেঙ্গুজ্বরের সাধারণ লক্ষণ :

❖ জ্বর (শরীরে তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়)
❖ মাথা ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা (বিশেষতঃ মেরুদন্ডে ব্যথা) বমি-বমি ভাব।
❖ শরীরে হামের মত দানা দেখা দেওয়া।

ডেঙ্গুজ্বরের ব্যবস্থাপনা :

❖ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডেঙ্গু জ্বর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।
❖ রোগীকে উপসর্গ অনুসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে এবং বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রচুর পানি ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে।
❖ দ্রুত জ্বর কমানো একান্ত জরুরী। এজন্য মাথা ধোয়া, ভিজা কাপড় দিয়ে গা মোছা এবং প্যারাসিটামল খেতে দেয়া যেতে পারে। এ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ কোনভাবেই খেতে দেয়া যাবে না।
❖ মারাত্মক(হেমোরেজিক) ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে/ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। *(জনসচেতনতায়: ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর)*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) : *মসজিদের একজন ইমাম ও খতীব, আমলদার এমনকি তাহাজ্জুদ সলাতও পড়ে, কিন্তু রাতে ঘুমাতে গেলে স্বপ্নে অনেক কিছু তাকে খাওয়ানো হয় এবং হারাম খাওয়ানোর চেষ্টাও করা হয়, তখন তার ঘুম ভেঙে যায়। এটা তার সাথে প্রতি রাতেই হয়ে থাকে, এর জন্য করণীয় কী। দয়া করে বলবেন।*

রোকন উদ্দীন, ফুলগাজী, ফেনী।

উত্তর : ভীতিকর, অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক স্বপ্নগুলোর পেছনে মূলত শয়তান ক্রিয়াশীল। এর উদ্দেশ্য মুমিনদেরকে কষ্ট দেয়া। তবে এতে শয়তানের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তা'আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কারো কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে এমনটি নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

উত্তম (আনন্দদায়ক) স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কষ্ট ও দুশ্চিন্তাদায়ক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যদি কেউ কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখে সে যেন তার বাম দিকে থুথু ছিটায় এবং নাউযুবিল্লাহি....পাঠ করে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়, এতে এই খারাপ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১]

খারাপ স্বপ্ন থেকে বাঁচতে সুন্নাহ নির্দেশিত আমল অনুসরণ করে শয্যা গ্রহণ করা উচিত। যেমন : অযু করে নেয়া, মাসনূন দু'আসমূহ পাঠ করা ও বিশেষত আয়াতুল কুরসী ও সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা এবং মুআবিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পাঠ করে দুই হাত ফুঁ দিয়ে মাথা থেকে নীচ পর্যন্ত শরীরে হাত মলে দেয়ার আমল যা তিন তিন বার করা ইত্যাদি আমল অবলম্বন করা জরুরি।

[১] *সহীহ বুখারী, হা : ৩২৯২।*

প্রশ্ন (২) : *অশুভ দৃষ্টির মাধ্যমে কি ভাগ্যে পরিবর্তন হয়?*

মাসুম রানা, শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : অশুভ বা হিংসাপূর্ণ দৃষ্টির ক্ষতির বিষয়টি বাস্তব এবং সঠিক। এর প্রভাব কোনো ব্যক্তি, তার পরিবার-পরিজন বা মাল-সামানার ওপর আপতিত হতে পারে। অশুভ দৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে হাদীসে নববীতে বর্ণিত,

عن ابن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين.

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, চোখের অশুভ দৃষ্টি সত্য; কোনো কিছু ভাগ্যকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার হলে অশুভ দৃষ্টি তাকে ডিঙ্গিয়ে যেত।[২]

উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত, অশুভ দৃষ্টি ভাগ্যকে অতিক্রম করত, এর অর্থ হলো : অশুভ দৃষ্টি সত্য। এর প্রভাব ব্যাপকভাবে কার্যশীল। এটা কোনো ধারণপ্রসূত বিষয় বা কুমন্ত্রণাজনিত ব্যাপার নয়।

অশুভ দৃষ্টির খারাপ প্রভাব সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾

কাফেররা যেন তাদের হিংসাত্মক দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে।[৩]

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাসীর رضي الله عنه বলেন, আয়াতটি দলীল হলো, চোখের অশুভ দৃষ্টির প্রভাব সত্য এবং ব্যাপক কার্যশীল।[৪]

[২] *সহীহ মুসলিম, হা : ২১৮৮।*
[৩] *সূরা আল-কালাম, আয়াত : ৫১।*

অশুভ দৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না বরং অশুভ দৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব ভাগ্যেরই অংশ। হাদীসে বর্ণিত কোনো কিছু ভাগ্যকে অতিক্রম করলে অশুভ দৃষ্টি তা অতিক্রম করত এর অর্থ প্রসঙ্গে ইবনু আব্দিল বার (রাহি) বলেন : এ হাদীস দলীল, মানুষ তাই লাভ করে যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে, আর অশুভ দৃষ্টি ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারে না; বরং এটাও তার ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

সুতরাং স্পষ্টত বুঝা গেল, অশুভ দৃষ্টি সত্য এবং প্রভাবপূর্ণ একটি বিষয়। তবে এটি মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে অশুভ দৃষ্টির নিজস্ব কোনো ক্ষমতাও নেই।

☞ প্রশ্ন (৩) : ***স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিয়ে দেয় তখন তাদের একটা বাচ্চা ছিল। এই বাচ্চাটাকে কোর্ট স্বামীর নিকট দিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা কি তার বাচ্চার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?***

মাসুম রানা, বিনোদপুর, শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : **স্বামী-স্ত্রীর তালাক** সম্পাদন হয়ে গেলে তাদের কোনো শিশু সন্তান থাকলে শিশু সন্তানের প্রতিপালনের জন্য মায়ের অগ্রাধিকার শারীয়্যাহ স্বীকৃত। এ মর্মে সন্তানের অগ্রাধিকার দাবিদার একজন নারীকে নাবী ﷺ বললেন :

أنت أحق به ما لم تنكح.

বিবাহিতা হওয়া পর্যন্ত তুমি এ সন্তানের হকদার।[৬]

সন্তান বুঝ-বুদ্ধিসম্পন্ন হলে সে পিতা-মাতা যে কারো সাথে থাকার জন্য বেছে নিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বালককে বললেন :

هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

এ হলো তোমার পিতা এবং এ হলো তোমার মাতা, তুমি যার হাত ইচ্ছা ধরে যেতে চাও, যাও।[৭]

তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর তালাকের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেও সন্তানদের সাথে কারো সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। এ ক্ষেত্রে সন্তানদের সাথে পিতা মাতার যে সম্পর্ক তা অটুট থাকবে, পিতা-মাতার করণীয় সন্তানদের প্রতি এবং সন্তানদের করণীয় পিতা-মাতার প্রতি তা থেকে যাবে। শরীয়ার গণ্ডীতে থেকে প্রত্যেকেই যার যার করণীয় আদায়ে চেষ্টা করবে।

☞ প্রশ্ন (৪) : ***আমরা জানি, মানবরচিত বিধান শিরক। তাহলে সরকারি চাকুরিজীবীরা কি সবাই শিরকের কাজে সহায়তা করছে? বিষয়টা বুঝিয়ে বলবেন। কখন কোন ক্ষেত্রে সেটা শিরক হবে?***

Hridoy, Kadirgonj, Rajshahi

উত্তর : মানব রচিত বিধানে শাসিত কোনো দেশে সরকারী চাকরীতে অংশ নেয়া জায়িয আছে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো চাকরীটি যেন পাপ বা সীমালঙ্ঘনমূলক না হয়। কারণ মহান আল্লাহর এই বিধান সর্বক্ষেত্রে পালনীয়।

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

সৎ কাজ ও সংযমমূলক কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর, তবে পাপ, সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতামূলক কাজে একে-অপরে সহযোগিতা করো না।[৮]

জামি তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়, আলী ﷺ এক ইয়াহুদীর বাড়িতে মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমাতে রয়েছে-

لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله، ولا يعين على معصية الله.

অর্থাৎ, অমুসলিম রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতামূলক কোনো কাজ বা আল্লাহ তা'আলার

[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর-৮/২০১।*
[৫] *আত-তামহীদ-৬/২৪০।*
[৬] *আবু দাউদ, হা : ২২৭৬।*
[৭] *আবু দাউদ, হা : ২২২৭।*
[৮] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ২।*

অবাধ্যতায় সহায়ক কোনো কাজ না হলে সে কাজ করতে কোনো বাধা নেই।[৯]

কোনো রাষ্ট্র মানবরচিত বিধানে চললেও সে রাষ্ট্রের বৈধ কাজের চাকরী করা বৈধ রয়েছে।

☞ প্রশ্ন (৫) : ***সলাতের সময় পায়জামা টাখনুর ওপরে গুটিয়ে নেওয়া যাবে কি? অথবা সর্বাবস্থায় টাখনুর ওপরে গুটিয়ে রাখলে কি গুনাহ হবে?***

গোলাম রাব্বি, বরিশাল

উত্তর : আপনার প্রশ্নে সলাতের সময় পায়জামা টাখনুর ওপরে গুটানোর কথা বলা দ্বারা যথাসম্ভব বুঝিয়েছেন সলাত শুরুর পূর্বে গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি। টাখনুর নীচে লুঙ্গী, প্যান্ট পাজামা ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরা পুরুষদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ .

টাখনুদ্বয়ের নীচে যা ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করা হবে তা দোযখে যাবে।[১০]

প্রশ্নকৃত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট জবাব হলো, সলাতের ভিতর চুল বা কাপড় গুটানো মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَ لاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرً.

আমি সাত অঙ্গে সাজদাহ করতে এবং কাপড় ও চুল না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।[১১]

প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদি লম্বা হলে কেটে খাটো করে নেয়াই করণীয়। তবে সলাতে প্রবেশের পূর্বে গুটিয়ে নেয়া মাকরুহের পর্যায়ভুক্ত নয়, যা সলাতের ভেতরে করা মাকরুহ।

☞ প্রশ্ন (৬) : ***স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের লজ্জাস্থানে মুখ লাগানোর হুকুম কী?***

আব্দুন নূর তুষার, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর একজন অপরজনের পোষাক স্বরূপ। একে অপর থেকে স্বাধীনভাবে সুখ অনুভব করে নেয়ার বৈধতা তাদের রয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর।[১২]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ, করেন :

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক স্বরূপ।[১৩]

তবে এই তোমাদের মধ্যে শরীয়া নির্ধারিত সতর্কতা মেনে চলতে হবে, আর তাহলো স্ত্রীর হায়েয় অবস্থায় তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হওয়া আর যেকোনো সময়ে স্ত্রীর পেছনদ্বার ব্যবহার করা হারামের অন্তর্ভুক্ত। বাকি অন্যান্য সার্বিক স্বাধীনতা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাধ্যমে ভোগ করতে পারে। তবে সুরুচি ও শালীনতাবোধ প্রত্যেকের স্বভাবজাত বিষয়, যা সে চাইলে মেনে চলতে পারে।

☞ প্রশ্ন (৭) ***বাংলাদেশের একজন সালাফী আলেম ঈদের তাকবীর হিসাবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ (তাবারানী) এই হাদীসের সনদকে জাল বলেছেন তবে যেকোনো সময় দুআ হিসাবে করতে পারবেন বলেছেন, আর ঈদের সহীহ তাকবীর বলেছেন-***

حدثنا يحي بن سعيد، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، وأجل الله أكبر، ولله الحمد

[৯] *ফাতাওয়া আল্‌লাজনা আদদায়িমা-১৪/৪৭৯।*
[১০] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৭৮৭।*
[১১] *সহীহ বুখারী, হা : ১৬।*
[১২] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২৩।*
[১৩] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭।*

(মুসান্নাফ ইবনু আবু শাইবা-৫৬৫৫/৫৬৭৫) এই বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা জানাবেন?

সাদ মুহাম্মাদ, বড় মির্জাপুর, খুলনা

উত্তর : ঈদের তাকবীর হিসেবে যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এর সনদ জাল হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। বরং তা সাহাবী ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর থেকে সুসাব্যস্তভাবেই বর্ণিত রয়েছে।[১৪]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঈদায়নের তাকবীর পাঠে প্রশস্ততা রয়েছে।[১৫]

সবচেয়ে বিশুদ্ধ যা বর্ণিত হয়েছে, মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রাজ্জাকে, সহীহভাবে তাহলো :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا[১৬]

তবে বক্তা মহোদয় যে তাকবীরটি শুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন সেই তাকবীরটিতে কিছু ভিন্নতা স্বাপেক্ষে শাইখ আলবানী (রাহি) বাইহাকীর বর্ণনায় বিশুদ্ধ বলেছেন।[১৭]

প্রশ্ন (৮) : *স্বর্ণ- রৌপ্য এবং খাদ্যদ্রব্য বাকীতে বেচা- কেনা বৈধ কি না?*

সাদ মুহাম্মাদ। বড় মির্জাপুর, খুলনা

উত্তর : স্বর্ণ রৌপ্য বাকীতে বেচা-কেনা বৈধ রয়েছে। খাদ্যদ্রব্য বাকীতে বেনা-বেচা বৈধ রয়েছে।

উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد.

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য একই পরিমাণ সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় জায়েয।[১৮]

নগদ অর্থ, স্বর্ণ রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত, আল্লামা আশ শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, স্বর্ণ কিংবা এর দাম যেকোনটি পরে দেয়া হলে তা সুদ হবে।[১৯]

অন্যদিকে বাকীতে খাদ্যপণ্য ক্রয় বিক্রয় বৈধ রয়েছে, এই মর্মে বিশুদ্ধ দলীল হলো-

عَنْ عَائِشَةَ-رضى الله عنها-قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ইয়াহুদীর কাছ থেকে স্বর্ণ বন্ধক রেখে বাকীতে খাদ্যপণ্য কিনেছিলেন।[২০]

প্রশ্ন (৯) : *নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাসি-খুশি ও রসিকতার ধরন কেমন ছিল? গোলাম রাব্বি*

উত্তর : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাবগতভাবে হাসি-খুশি মেজাযের ছিলেন। বদ মেজায ও আচরণগত রূঢ়তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাসি ছিল অতিরঞ্জনবঞ্চিত ও চমৎকার। তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন না। তিনি সর্বদাই মুচকি হাসতেন।

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما.

আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হাসতেন তখন মুচকি হাসতেন।[২১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বেশি হাস্যোজ্জল চেহারায় থাকতেন।

আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

---

[১৪] *মুসান্নাফ ইবনু আবু শাইবা-২/১৬৫-১৬৮, ইরওয়াউল গালীল-৩/১২৫।*

[১৫] *আলজামি লি আহকামিল কুরআন-২/৩০৭।*

[১৬] *ফাতহুল বারী-২/৪৬২।*

[১৭] *ইরওয়াউল গালীল-৩/১২৬।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৫৮৭।*

[১৯] *ফাতাওয়া নূর আলাদারব-২২৮৬৯।*

[২০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯৯৯, সহীহ মুসলিম, হা : ১৬০।*

[২১] *তিরমিযী, হা : ৩৬৪২, সহীহ বুখারী, হা : ৩০৩৫।*

ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো এত অধিক মুচকি হাস্যকারী আর কাউকে আমি দেখিনি।[২২]

নাবী ﷺ অনেক সময় রসিকতাও করতেন। তবে তাঁর রসিকতা কখনো মিথ্যাশ্রয়ী হতো না বরং তা হলো সত্যতাপূর্ণ। তাঁর রসিকতাসমূহ অনেক হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে 'এক বৃদ্ধা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল,

يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ. فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ". قَالَ: فَوَلَّت تَبْكِي، قَالَ: "أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا}

হে আল্লাহর রাসূল, দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতে দাখিল করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওহে অমুকের মা, জান্নাতে তো কোনো বৃদ্ধা যাবে না। রাবী হাসান ﷺ বলেন, মহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও তিনি বৃদ্ধা অবস্থাতে জান্নাত যাবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তাদেরকে আমি করব বিশেষ সৃষ্টি, তাদেরকে করব কুমারী, সোহাগিনী ও কুমারী।[২৩]

☞ প্রশ্ন (১০) : *নিম্নে উল্লিখিত দু'আগুলি সহীহ এবং আমলযোগ্য কিনা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।*

১। আল্লাহুম্মা আতিনী কিতাবী বিইয়ামিনী।

২। আল্লাহুম্মা আতিনী আফজালা মা তুতি ইবাদিকাস্ সলিহীন।

৪। আল্লাহুম্মা সাব্বিত কাদামাইয়া ইয়াসমা তুযিল্লুফিহীল আকদামো।

৫। আল্লাহুম্মা গাস্সীনী বে-রাহমাতিকা ওয়া জান্নিবনী আযাবাকা।

৬। আল্লাহুম্মা আহয়িনী মুসলিমান, ওয়া আমিত্নী মুসলিমান।

গিয়াস উদ্দিন, ৭০২ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা

উত্তর : আপনার প্রদত্ত ৬টি দু'আ কোনো অপ্রামাণ্য বইপত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। লিখিতরূপে মাসনূন কোনো দু'আ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নেই। দু'আগুলো নিজস্বভাবে গড়ে নেয়া হয়েছে। আপনি এই দু'আগুলো বাদ দিয়ে বরং বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত বই পুস্তক থেকে দু'আ শিখুন এবং আমল করুন, যেমন একটি নির্ভরযোগ্য দুআর বই, হিসনুল মুসলিম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকল জনসাধারণের করণীয় :

❖ ডেঙ্গু কী : ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জ্বর। এডিস মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের একমাত্র বাহক। এ মশার কামড়ে ডেঙ্গু ছড়ায়। এডিস মশা দিনের বেলায়, সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যায় কামড়ায়।

❖ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ, ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

❖ বাড়ির ভিতর/বাহির/ছাদ এবং আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা অপ্রয়োজনীয় পাত্রসমূহ ডাষ্টবিনে ফেলে দিন। বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখুন।

❖ ব্যবহার যোগ্য পাত্রসমূহে (যেমন : বালতি, ড্রাম, ফুলের ও গাছের টব, ফ্রিজ এবং এয়ার কন্ডিশনারের নীচের পানি ভর্তি পাত্র ইত্যাদি) পানি কোনভাবেই যেন একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের বেশী যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্যে রাখুন এবং প্রয়োজনে অপসারণ করুন।

❖ অব্যবহৃত গাড়ির টায়ার, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত চৌবাচ্চা, পরিত্যক্ত টিনের কৌটা, প্লাষ্টিকের বোতল/ক্যান, গাছের কোটর, পরিত্যক্ত হাড়ি, ডাবের খোসা ইত্যাদিতে ০৫ (পাঁচ) দিনের বেশি যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্যে রাখুন এবং প্রয়োজনে অপসারণ করুন।

মনে রাখতে হবে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল নাগরিকের সক্রিয় সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন"

জনসচেতনতায় :
ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তর

[২২] *তিরমিযী, হা : ৩৬৪১, আহমাদ, হা : ১৭৭০৪।*
[২৩] *সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৭, তিরমিযী, আলবানী হাসান বলেছেন।*